ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট

ফিয়োডোর ডস্টয়েভস্কি

ভাষান্তর । সৈয়দ হালিম

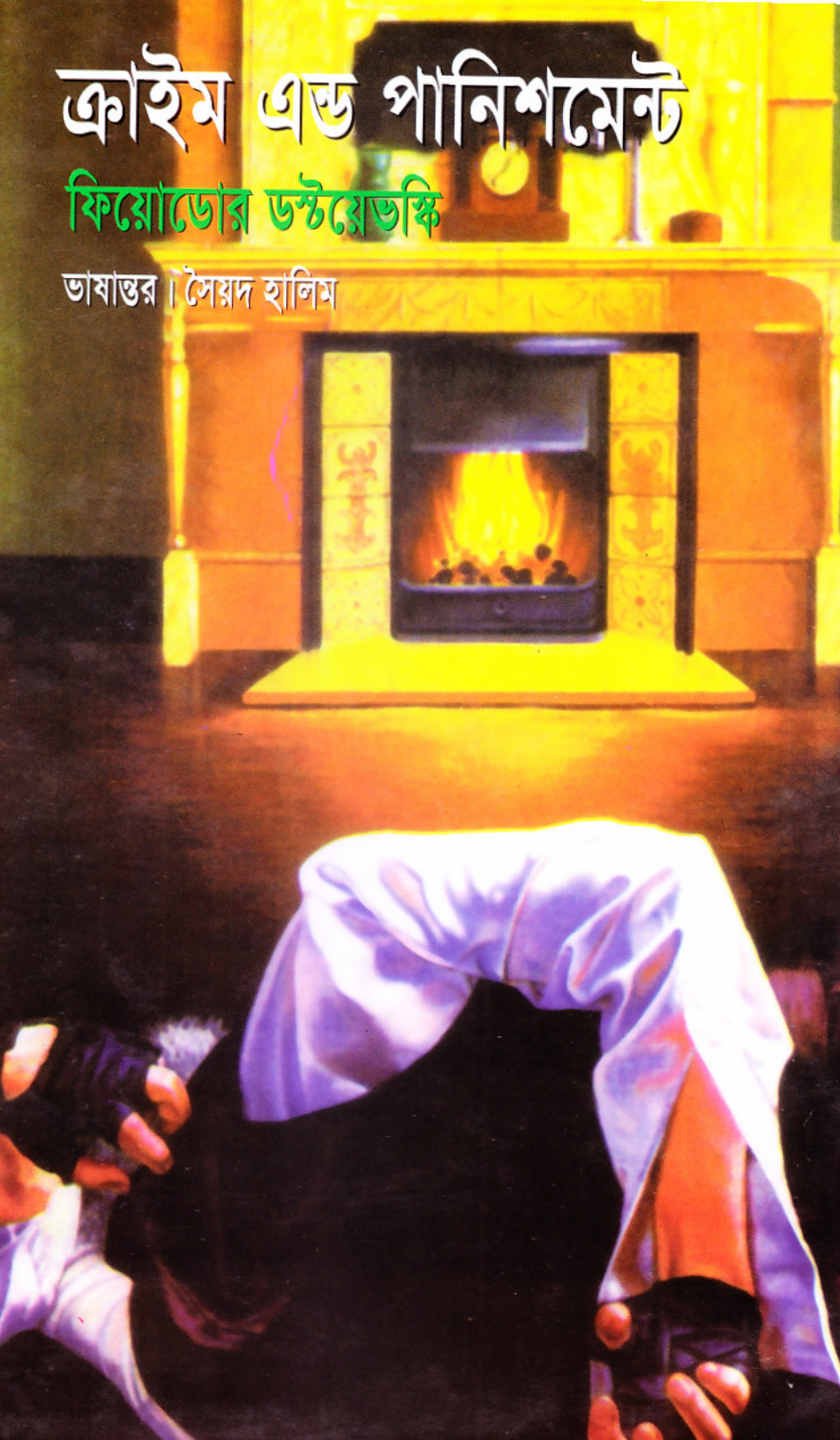

ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট

ফিয়োডোর ডস্টয়েভস্কি

ভাষান্তর । সৈয়দ হালিম

ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট
মূল : ফিয়োডোর ডস্টয়য়েভস্কি
অনুবাদ : সৈয়দ হালিম

প্রকাশক
বর্ণনা
রুমী মার্কেট
৬৮-৬৯ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

একমাত্র পরিবেশক
মীরা প্রকাশন
রুমী মার্কেট
৬৮-৬৯ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১০-৮৫৩১৫৮, ০১৬৮৩-৮০৭৪৪৪
E-mail: meeraprokashon@yahoo.com

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ২০০২
দ্বিতীয় মুদ্রণ: মে ২০১১
তৃতীয় মুদ্রণ: জুন ২০১২
চতুর্থ মুদ্রণ: মে ২০১৩

প্রচ্ছদ
কালার মেকার

মুদ্রণে
ঢাকা প্রিন্টার্স
৩৬ শ্রীশদাশ লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য
একশত টাকা মাত্র
পাঁচ ডলার

CRIME AND PUNISHMENT by Fiodor Dostoevsky: Retold by Syed Halim Published by Bornona, Rumi Market, 68-69 Paridas Road, Banglabazar, Dhaka-1100. Phone: 7175225, Mobile: 01710-853158, 01683-807444. 1st Print : October 2002. 4th Print : May 2013

Price: 100.00 US$ 5

ISBN: 984-8327-03-7

লেখক পরিচিতি

ফিয়োডোর ডস্টয়েভস্কি ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের ১১ই নভেম্বর মস্কো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তরুণ বয়সে তিনি যোগদান করেন রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে। সুবিস্তৃত রুশ সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি তখন 'জার'।

ফিয়োডোর শৈশব থেকেই ছিলেন ভাবুক, কল্পনাপ্রবণ। তাই এ চাকরিজীবন বেশিদিন ভাল লাগলো না তাঁর। তিনি চাইলেন তাঁর মনের নিত্যনতুন ভাবগুলো লেখার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলবেন। বই লিখবেন স্থির করলেন তিনি।

১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দের মাত্র ২৪ বছর বয়সে বের হলো তাঁর বই পুয়োর ফোক বইটি পড়ে সবাই মুগ্ধ হলেন।

তাঁর দিকে কঠোর দৃষ্টি রাখলো রাশিয়ার আমলাতন্ত্র। আমলারা ভাবলেন দরিদ্রের সুখ-দুঃখ নিয়ে এর এত মাথাব্যথা কেন ? গরিব হয়ে যারা জন্মেছে, অভিশপ্ত জীবন-যাপনই হচ্ছে তাদের নিয়তি। তার বিরুদ্ধে ইঙ্গিত দিতে সাহস করে, কে এই লোক ?

ডস্টয়েভস্কি পুলিশের দৃষ্টি এড়াতে পারলেন না। তিন বছর পরে এক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগে জার তাঁকে পাঠালেন সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে...।

ফিয়োডোর নেই। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে ২৮শে জানুয়ারি তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কিন্তু পৃথিবী যতকাল থাকবে, মানুষের স্মৃতিপটে তিনি অবিনশ্বর হয়ে থাকবেন।

এক

জুলাইয়ের শুরু। প্রচণ্ড গরম। খুপরির মত ঘর থেকে নেমে এল এক তরুণ। এগিয়ে চলল কোহুশকিন ব্রীজের দিকে। সবে সন্ধ্যে হয়েছে। তার হাঁটার ধরন দেখেই বোঝা যাচ্ছে, কোনদিকে যাওয়া যায়—এখনো ভেবে ঠিক করে উঠতে পারেনি। ঘরে বসে থাকতেও ভালো লাগছ না; তাই পথে বেরিয়ে আসা।

ভাড়া করা খুপরি ঘর থেকে নেমে আসবার সময়ে বাড়িওলির চোখে ধুলো দিয়েছে প্রতিবারের মতো। সিঁড়ি দিয়ে নামতেই বাড়িওলির রান্নাঘর। দরজা খোলা থাকে সব সময়ে। ঠিক এই সময়টাতে বুক ঢিব ঢিব করতে থাকে তরুণের। বড় কাপুরুষ মনে হয় নিজেকে, তারপরেই ধিক্কার দেয় নিজেকে—এত ভয় কেন?

ভয় তো দেনার জন্যে। অনেক টাকা পাবে বাড়িওলি। কানাকড়িও দিতে পারেনি তরুণ। থাকে সে পাঁচতলা বাড়ির চিলে কোঠায়। ঘর তো নয়, যেন আলমারি।

অথচ সে সত্যি সত্যি কাপুরুষ নয়। ঠিক উল্টো। মেজাজ খিঁচড়ে আছে বেশ কিছুদিন ধরে উৎকণ্ঠায় বেকার হয়ে থাকার দরুন। মনও তাই মুষড়ে আছে। বিমর্ষতা চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছলে মন-মেজাজ এইরকমই দাঁড়ায়। একলা থাকতে ইচ্ছে হয়। দুনিয়ার কারো সঙ্গে মুখোমুখি হতে মন চায় না—বাড়িওলির সঙ্গে তো নয়ই।

এই ভয় থেকেই এসেছে কাপুরুষতা। কিছুদিন ধরে দারিদ্র্যের বোঝাও যেন ওকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। প্রতিদিন কত কাজই তো থাকে—আগ্রহ নেই কোনো কাজে। আগ্রহ যে ফিরিয়ে আনবে সে আগ্রহও নেই তার। কেউ যেন চারদিকে ঘোর ষড়যন্ত্র জাল বুনে চলেছে মানুষটাকে ঘিরে। ভয় বাড়িওলিকে নয়—কাউকেই নয়। থোড়াই কেয়ার করে সে ষড়যন্ত্রকে—অথচ মন মুষড়ে আছে নিদারুণ।

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময়ে বাড়িওলির চোখে পড়লেই রোজই শুনতে হয় সেই একই গান...একই ঘ্যানঘ্যানানি...একই ভয় দেখানো। ভাড়া না দিলে অমুক করেঙ্গা, তমুক করেঙ্গা! বানিয়ে বানিয়ে কাঁহাতক আর মিথ্যে বলা যায়। তার চাইতে বেড়ালের মত পা টিপে টিপে নেমে যাওয়া ভাল।

রাস্তায় নেমে এসে কিন্তু বেজায় হাসি পেল তরুণের। এত ভয় বাড়িওলিকে?

হাসিটা কিন্তু তার অদ্ভুত ধরনের। কথাও বলে সে আপন মনে—'আশ্চর্য! যা করব বলে ভেবে রেখেছি, সে কাজ তো পুরুষ মানুষের হাতের পাঁচ! তবুও এত ভয়!...না, বড্ড বেশি কথা বলছি আজকাল। মনে মনে আকশ-পাতাল রচনা করছি!'

গরম আর সহ্য করা যচ্ছে না। এত ভিড়, গায়ে গায়ে ঘষাঘষি, ইঁট-চুন-ধুলোর গন্ধ। রাজমিস্ত্রীদের তৈরি বাড়ি, সব মিলিয়ে গ্রীষ্মের এই পচা গন্ধ পিটার্সবার্গবাসীদের সহ্য করতেই হয় প্রতি গ্রীষ্মে—গ্রীষ্ম-কুটিরে বাস করার মতো পয়সা যাদের নেই—তাদেরকেই সহ্য করতে হয়ই এসব।

সামান্য এই ভাড়ার চিন্তায় তরুণের স্নায়ুতে দারুণ চাপ পড়ে। এমনিতেই মনটা খারাপ হয়ে রয়েছে—তার ওপর আবার এই অত্যাচার। অসহ্য!

শহরের এদিকটায় মাতালদের ভিড়ও বেশি। মদের দোকানও কম নয়। ছুটির দিন নয় আজ—তা সত্ত্বেও মত্ত মানুষদের ভিড় লেগেই আছে। এদের গায়ে গা লাগতেই আরও মুষড়ে যাচ্ছে মন—রাগ বাড়ছে।

এ সবকিছুই ঘৃণা করে তরুণটি। ঘৃণা চেপে রাখতেও পারছে না সে। মুখ বেঁকে গেছে তাই। মুখ মনের অনুভূতি ফুটিয়ে তুলতে পারে সহজেই; তাই সে গোপন করতে পারছে না মনের গভীর ঘৃণাবোধকে।

তরুণের চেহারাটা কিন্তু চমৎকার! রীতিমত সুদর্শন। বেশ লম্বা, দশজনের ভিড়ে দাঁড়ালে মাথা উঁচু হয়ে থাকে সবার ওপরে। ছিপছিপে শরীর অথচ সুগঠিত। দু' চোখ গভীর কালো আর ভারি সুন্দর। মাথাভর্তি ঈষৎ কালচে অথচ সোনালি চুল মুখের সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে দিয়েছে শতগুণ।

ঘৃণায় মুখ কুঁচকে গিয়েছিল ক্ষণেকের জন্যে। তারপরেই ফের বিভোর হয়ে গেল চিন্তায়। এমনই মশগুল হয়ে রইল গভীর ভাবনায় যে আশপাশে আর নজরই রইল না। নজর দেওয়ার প্রবৃত্তিও নেই। কথা বলে চলছে আপনমনে। নিজের কথা নিজেই শুনছে। বুঝতে পারছে, তালগোল পাকিয়ে রয়েছে মনের ভাবনাগুলো।

দুর্বলতার জন্যেও এমন হতে পারে। এই নিয়ে দুদিন হল, না খেয়ে আছে। জামাকাপড়ের অবস্থাও শোচনীয়। ভিখিরি ভবঘুরেও এমন গরিবহালে দিনের আলোয় পথে বেরোতে লজ্জা পাবে। শহরের এই অঞ্চলে অবশ্য কোনো কিছুই কাউকে অবাক করেনা বলেই রক্ষে। বাজে মেয়ে আর পাঁচ কাজের ব্যাপারীদের ভিড় এখানে এত বেশি যে কোনো কিছুই বিস্ময়কর লাগে না কারো চোখে।

তরুণের রুচিবোধ কিন্তু মাঝে মধ্যে মাথাচাড়া দেয়। জামাকাপড় নিয়ে খুঁতখুঁতুনি তার মধ্যেও আছে। এই মুহূর্তে গোটা দুনিয়াটার ওপর মনটা তার এমনই বিষিয়ে গেছে যে, নিজের গায়ের ছেঁড়াফাটা জামাকাপড়ের দিকে খেয়াল নেই একেবারেই।

আসলে গোটা দুনিয়াটার ওপর বিদ্বেষে ভরে আছে ওর মনের ভেতরটা। বাইরের দুনিয়ার দিকে তাই ভ্রূক্ষেপ নেই। পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা হলে অবশ্য আলাদা ব্যাপার হতো। কিন্তু যেচে কারো সঙ্গে দহরম-মহরম করতে যাওয়ার ইচ্ছে নেই।

ঠিক এই সময়ে একটা ঘোড়ায় টানা গাড়ি প্রায় এসে পড়ল ওর গায়ের ওপর। মাতাল একটা লোক রয়েছে গাড়ির ওপর। তরুণকে দেখেই আচমকা সে কি চিৎকার—'এই ব্যাটা! জঘন্য এই জার্মান টুপিটা মাথায় পরে আছিস কেন?'

বলেই হাত নেড়ে বিকট উল্লাস জানিয়ে নিমেষে উধাও হয়ে গেল পাগল লোকটা ঘোড়ার গাড়ি হাঁকিয়ে।

তখনই খেয়াল হল সুন্দর তরুণের, সত্যিই তো! মাথার টুপিটা জিমারমান জার্মান টুপি। তুবড়ে, থেঁতলে এর বেতিকিচ্ছিরি চেহারা হয়েছে। চারদিকে অজস্র ফুটোও আছে। মাথায় তেড়াবেকাভাবে আটকে রয়েছে—লোকে তো হাসবেই।

এ অবস্থায় লজ্জায় মিইয়ে যাওয়া উচিত। তরুণ কিন্তু লজ্জা পেল না। ভয় পেল। মনটাকে সাপের মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে অবশ করে তুলল অদ্ভুত এক ভয়।

আবার শুরু হল মনেমনে বকুনি—'কী আশ্চর্য! পাঁচজনের চোখে পড়ার মত বিকট এই টুপি পরে আছি কেন? এমন টুপি মাথায় দিতে হবে যা সবার চোখ এড়িয়ে যাবে। গায়ে যেহেতু ছেঁড়া কাঁথার মত জামাকাপড়—মাথার টুপিও হওয়া উচিত কুলি-কামিনের টুপির মতন। দামি জার্মান টুপি পরা খুব ভুল হয়েছে। ছোট্ট এই ভুল থেকেই গোটা প্ল্যানটা ভেস্তে যেতে পারে।'

বেশিদূর আর যেতে হল না। বাড়িটার ফটক এখান থেকে আর মাত্র সাতশ তিরিশ পা দূরে। স্বপ্নে এটা সে গুনেছে কতবার!

একটা সময় গেছে যখন এসব স্বপ্নকে মোটেই পাত্তা দেয়নি তরুণ। কদাকার স্বপ্নগুলোকে মনের মধ্যে আনাগোনাও করতে দেয়নি। স্বপ্নের প্রলোভনেও পড়েনি আগে।

ঝাড়া একমাস এইসব লোভনীয় অথচ বীভৎস স্বপ্ন দেখবার পর মনের অবস্থা দাঁড়িয়েছে অন্যরকম। স্বপ্ন এখন ওকে লোভাতুর করে তুলেছে। মন না চাইলেও কুৎসিত স্বপ্নকে রূপ দিতে চলেছে। মনের মধ্যে ইচ্ছে আর অনিচ্ছের লড়াই চলছে বিরামহীনভাবে। বিড়বিড় করে বকেও যাচ্ছে সেই কারণে।

এখন সে চলেছে স্বপ্ন রূপায়ণ সম্ভব হবে কি করে, তা যাচাই করার সঙ্কল্প নিয়ে। এক এক পা এগোচ্ছে। একটু একটু করে মন উত্তেজিত হয়ে উঠছে এ জন্যেই।

প্রকাণ্ড একটা বাড়ির দিকে এগোচ্ছে তরুণ। এ বাড়িটা রয়েছে একটা খালের পাশেই। অন্য পাশে রয়েছে সাদোভাইয়া স্ট্রিট। বুকের মধ্যে যেন সাঁই সাঁই করে হাপর ওঠানামা করছে। শরীরের প্রত্যেকটা স্নায়ু সজাগ।

এ বাড়িতে ফ্ল্যাট অনেক। নানা ধরনের বাণিজ্য চলেছে ঘরে ঘরে। দরজি, মিস্ত্রী, রাঁধুনি, জার্মান ধান্দাবাজ, বাজে মেয়ে, কেরানি—আরও কত রকম মানুষ দখল করে রয়েছে এক-একটা ফ্ল্যাট। বাড়িতে ঢুকবার মুখে উঠোন দু'টোয় নানা ধরনের মানুষ আসা-যাওয়া করছে। জনা দুই দারোয়ানও নিজেদের কাজ করে যাচ্ছে।

নিশ্চিন্ত হল তরুণ। কারোরই চোখ নেই তার মতো বিবর্ণ চেহারার মানুষের দিকে। টুক করে ফটক পেরিয়ে ডাইনে মোড় নিয়ে পা দিল সিঁড়িতে।

এ সিঁড়িটা বাড়ির পেছন দিককার সিঁড়ি। তাই বেশ অন্ধকার। রীতিমত সরু। অথচ কোথায় কি আছে, সবই সে জানে। নখদর্পণে বললেই চলে। এর আগেও এসেছে। সিঁড়ির আঁধার আর নির্জনতা মনটাকে খুশিতে ভরিয়ে তুলেছে। কোনো কৌতূহলী চোখ এই অন্ধকার ফুঁড়ে তাকে দেখতে পাবে না।

চারতলায় উঠেই আবার ভয় ঢুকল মনের মধ্যে। বিড়বিড় করতে লাগল আপনমনে—'কাজটা যদি করেই ফেলি, তাহলে কি ঠিক হবে?'

চারতলার পথ জুড়ে রয়েছে একটা ফ্ল্যাটের আসবাবপত্র। এ ফ্ল্যাটে থাকত এক জার্মান কেরানি বউ-বাচ্চা নিয়ে। এখন নিশ্চয়ই ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিচ্ছে—তাই ফার্নিচার বের করছে।

তাহলে তো ভালই হল। চারতলার এই সিঁড়ি পেরিয়ে বুড়ির ফ্ল্যাট ছাড়া আর কোনো ফ্ল্যাট নেই। ভাল...ভাল...

এসে গেছে বুড়ির নিরালা ফ্ল্যাট। দরজার ঘণ্টা বাজিয়ে দিল তরুণ। টুনটুন করে বাজছে ঘণ্টা—যেন টিন দিয়ে তৈরি—পেতল দিয়ে তৈরি হলে আরও জোর আওয়াজ হতো।

অবশ্য বিশাল এই বাড়ির পায়রার খোপের মত ছোট ছোট ঘরগুলোয় ঘণ্টা বাজে এই রকমই মিনমিনে আওয়াজে। ব্যাপারটা ভুলেই গেছিল তরুণ। উৎকণ্ঠায় মনের অবস্থা সত্যিই শোচনীয় হয়ে এসেছে। নইলে ঘণ্টার ওই ক্ষীণ আর্তনাদ শুনে অমন শিউরে উঠবে কেন?

ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হল একটু পরেই। পাল্লা ফাঁক হচ্ছে। সামান্য ফাঁক হতেই ফ্ল্যাটের ভাড়াটে বিষম বিতৃষ্ণায় চেয়ে রইল তরুণের দিকে। বিতৃষ্ণা ছাড়াও পিটপিটে দুই চোখে রয়েছে রাজ্যের অবিশ্বাস।

শুধু চোখ দু'টোই দেখতে পাচ্ছে তরুণ। ওটুকু ফাঁক দিয়ে সন্দেহ আর অবিশ্বাসভরা একজোড়া চোখ ছাড়া আর কিছু দেখাও যাচ্ছে না। অন্ধকারের মধ্যে ঝিকঝিক করছে শুধু দু'টো চোখ।

চৌকাঠ পেরিয়ে সামনের ঘরে ঢুকে গেল তরুণ।

এ ঘরেও অন্ধকার বিরাজ করছে। ঘরের মাঝে একটা কাঠের পার্টিশন। পার্টিশনের ওদিকে ক্ষুদে রান্নাঘর। আর ঠিক এখানেই দাঁড়িয়ে আছে বুড়ি। মুখে কোনো কথা নেই। কিন্তু চাহনির মধ্যেই অনেক জিজ্ঞাসা জেগে রয়েছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে তরুণের পা থেকে মাথা পর্যন্ত।

বুড়ির বয়স প্রায় ষাট। ছোটখাট চেহারা। শুকনো রুটির টুকরোর মতই যেন শুকিয়ে গুটিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। চোখ দু'টো কিন্তু বেশ ধারালো আর নোংরা!

টিকালো নাক। ছোট্ট মাথায় টুপি নেই। চুল সামান্য পেকেছে। তেল দিয়ে সেঁটে লাগানো মাথায়। ফ্লানেলের চাদর জড়ানো গলায়। গলাটা সরু আর লম্বা। মোরগের নখওলা থাবার মত উঁচিয়ে রয়েছে চাদরের ঘেরাটোপ থেকে।

গরমে আইঢাই অবস্থা হয় তরুণের। বুড়ি কিন্তু এই বিচ্ছিরি গরমেও একটা পশুলোমের জ্যাকেট গায়ে চাপিয়ে রেখেছে। কাশছে খক্‌খক্ করে।

এ হেন বিচিত্র মূর্তির দিকে নিশ্চয়ই অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে ধরেছিল তরুণ, নইলে বুড়ির চোখে অবিশ্বাস ফের ঘনিয়ে উঠবে কেন?

তাই দেখেই তড়িঘড়ি বলে ওঠে তরুণ—'আমি রাসকোল্‌নিকভ। ছাত্র। মাসখানেক আগে একবার এসেছিলাম।'

এ অবস্থায় বিনয়ের অবতার হওয়া উচিত। তাই বাতাসে মাথা ঠুকে ছোট্ট অভিবাদনও সেরে নেয় সে।

তীক্ষ্ণ গলায় তক্ষুণি জবাব দিল বুড়ি—'মনে আছে।'

তরুণের মুখের ওপর থেকে কিন্তু সরে গেল না বুড়ির সন্ধানী চোখ।

এত অবিশ্বাস! অস্বস্তি বোধ করে রাসকোল্‌নিকভ।

আমতা আমতা করে বলে—'এসেছি একই উদ্দেশ্যে—'

একটু ভেবে নিয়ে পাশে সরে দাঁড়ায় বুড়ি—'ভেতরে এসো।'

যে ঘরে ঢুকল রাসকোল্‌নিকভ, সে ঘরে তত অন্ধকার নেই। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় দেখা যাচ্ছে দেওয়ালে সাঁটা হলদে কাগজ, জানালায় হিজিবিজি জিরেনিয়ামের রঙিন ফুল আর রঙবেরঙের ছিটের পর্দা।

এই দেখেই বিদ্যুৎঝলকের মতো ভেবে নিল রাসকোল্‌নিকভ—'সেদিনও ঠিক এইভাবে সূর্য ঝকঝক করবে ঘরের মধ্যে!'

ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎবেগে চোখ বুলিয়ে নিলো ঘরের সবকিছুর ওপর। কিছুই বাদ দিল না—মনের ম্যাপে টুকে নিলো প্রতিটি জিনিস। এই তো সুযোগ। সবই দেখতে হবে। স্মৃতিতে গেঁথে রাখতে হবে। সময় এলে যেন ঠিক জিনিসটা ঝটপট সরিয়ে ফেলা যায়।

তবে হ্যাঁ, ঘরের মধ্যে সেরকম বিশেষ কিছুই নেই। ফার্নিচার সবই মান্ধাতার আমলের। হলদে কাঠ দিয়ে তৈরি। একটা প্রকাণ্ড পিঠ-উঁচু সোফা—সামনে বসানো একটা কাঠের খোদাইকরা গোল টেবিল। একটা সাজগোজ করার টেবিল। দুটো জানলার ফাঁকে রয়েছে একটা আয়না। দেয়ালের পাশে বসানো খান কয়েক চেয়ার। হলদে ফ্রেমে বাঁধানো কয়েকটা সস্তা ছবি—জার্মান মেয়েদের ছবি নিশ্চয়—পাখি ধরে রয়েছে হাতে।

ফার্নিচার বলতে তো এই। এক কোণে একটা মূর্তি—সামনে জ্বলছে একটা তেলের প্রদিপ।

প্রতিটি জিনিস কিন্তু ঝকঝকে তকতকে। মেঝে আর ফার্নিচার দুটোই নিশ্চয় পালিশ করা হয় রোজ—তাই এত চকচকে।

আপনমনেই ফের বিড়বিড় করে ওঠে রাসকোল্‌নিকভ—'নচ্ছার বিধবা বুড়িদের ঘর এত পরিষ্কার হয়—এক কণা ধুলোও রাখেনি কোথাও।'

বলতে বলতে হাত দিল দরজার ছিটের সুতি-পর্দায়। এ পর্দা ঝুলছে দুই ঘরের মাঝের দরজায়। এ ঘরে এখনো ঢোকেনি রাসকোল্‌নিকভ। ওদিকে রয়েছে বুড়ির শোবার খাট আর জিনিসপত্রের দেরাজ-আলমারি। ফ্ল্যাটে ঘর বলতে এই দু'টোই—আর নেই।

ঘরের মধ্যে উঁকি দিতেই বুড়ি ধড়মড় করে এসে দাঁড়াল সামনে। পথ আটকে দাঁড়িয়েছে।

বলে উঠল কড়া গলায়—'কি চাই?'

পকেট হাতড়ে সেকেলে, চ্যাপটা, রুপোর ঘড়িটা বের করে রাসকোল্‌নিকভ। পেছনের ডালায় খোদাই করা রয়েছে একটা ভূগোলক। শেকলটা ইস্পাতের।

বললে—'বন্ধক দিতে এসেছি।'

'গতবার যেটা বন্ধক রেখে গেলে, তার মেয়াদই ফুরিয়েছে। গতকাল চলে গেছে টাকা দেবার শেষ তারিখ।'

'একটু ধৈর্য ধরুন, ম্যাডাম। কথা দিচ্ছি, সুদ সমেত আসল ফিরিয়ে দেব।'

'সেটা তো বলব আমি। মেয়াদ পেরিয়ে গেছে, বন্ধকী বেচেও দিতে পারি এখনি।'

'ঘড়ির জন্যে কত দেবেন, অ্যালিওনা আইভানোভনা?'

'কোথাকার রদ্দি এক মর্চে-পড়া ঘড়ি! কারো কাজে লাগবে না। গতবার আংটিটার বদলে নিয়ে গেছিলে দু রুব্‌ল। যেটা কোনো গয়নার দোকানে দেড় রুব্‌লেই কিনে নিতে পারতাম।'

'চার রুব্‌ল দিন। সব ফেরৎ নেব। এ ঘড়ি আমার বাবার। দিন কয়েকের মধ্যে হাতে বেশ কিছু টাকা আসবে।'

'দেড় রুব্‌লের এক পয়সাও বেশি দেব না—সুদ আগে দিতে হবে। নিতে হলে নাও, নইলে বিদেয় হও।'

'মাত্র দেড় রুব্‌ল!'

'সরে পড়ো,' রাসকোল্‌নিকভের হাতে ঘড়ি গছিয়ে দিয়ে বললো বুড়ি। মাথায় রক্ত চড়ে গেলেও সামনে নিলো সে। ইচ্ছে হচ্ছিল এখুনি ছুটে বেরিয়ে যায়। কিন্তু তাহলে তো যে মতলবে আসা, সেটাই হয় না।

রুক্ষ গলায় বললো—'ঠিক আছে, দিন।'

চাবির খোঁজে পকেটে হাত ঢোকায় বুড়ি। তারপর চলে যায় পর্দার ওদিকে পাশের ঘরে।

ঘরে এখন রাসকোল্‌নিভক একা। কান খাড়া করে শুনছে পাশের ঘরের ক্ষীণতম আওয়াজও। মনের চোখে অনুসরণ করে চলেছে বুড়িকে। দেরাজ-আলমারি

খোলার শব্দ ভেসে এল কানে। 'নিশ্চয় ওপরের ড্রয়ার,' মনে মনে ভেবে নেয় রাসকোল্‌নিকভ—'চাবির গোছা রাখে ডান-হাতি পকেটে...ইস্পাতের রিঙে রয়েছে সমস্ত চাবি...একটা চাবি অন্য চাবিদের চেয়ে তিন গুণ বড়...মাথায় খাঁজকাটা...দেরাজ-আলমারির চাবি নয় নিশ্চয়...আর একটা আলমারি অথবা সিন্দুক আছে বলে মনে হচ্ছে...অদ্ভুত...সব সিন্দুকেরই চাবি একই রকম...যাচ্ছেতাই কারবার...'

ফিরে এল বুড়ি।

'এই নাও। রুব্‌ল পিছু মাসে দশ কোপেক, দেড় রুব্‌ল থেকে প্রতি মাসের পনেরো কোপেক বাদ। একই হারে, আগের নেওয়া দু রুব্‌ল থেকে বাদ গেল বিশ কোপেক। মোট দাঁড়ালো পঁয়ত্রিশ। তাহলে তুমি পেলে এক রুব্‌ল পনেরো কোপেক—রদ্দিমার্কা এই ঘড়ির জন্যে।'

'মাত্র এক রুব্‌ল পনেরো কোপেক!'

'কড়ায় গণ্ডায়।'

তর্কের মধ্যে গেল না তরুণ। বলার অনেক কিছুই ছিল—সেসব কথা জিভের ডগাতেও এসে গেছিল কিন্তু কিছুই না বলে হাত পেতে সামান্য অর্থ নিতে নিতে একদৃষ্টে চেয়ে রইল বুড়ির দিকে—তাড়াহুড়োর লক্ষণ দেখা গেল না হাভভাবে।

তারপর আস্তে আস্তে বললো—'দিন দুয়েকের মধ্যে আরও একটা জিনিস আনব। বন্ধুর দেওয়া উপহার। রুপোর সিগারেট কেস।'

চুপ মেরে গেল এটুকু বলেই। মাথার মধ্যে যেন সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

'যখন আনবে, তখন দেখা যাবে।'

'তাহলে চলি,' বাইরের ঘরে বেরিয়ে যেতে যেতে কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রেখে বললো সে—'ভালো কথা, আপনার বোনকে তো দেখছি না! একলাই থাকেন নাকি?'

'তা নিয়ে তোমার দরকার কি?'

'কিস্‌সু না...এমনিই জিজ্ঞেস করলাম...আপনি তো রয়েছেন...চলি, অ্যালিওনা আইভানোভনা!'

তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল রাসকোল্‌নিকভ। উত্তেজনায় কাঁপছে সারা শরীর! একি হঠকারিতা করে বসল সে! পুরো একটা মাস ধরে মনকে এত শায়েস্তা করার পরেও নেমে পড়ল নোংরা এই কাজে! ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে কতবার থামল আর ঘোলাটে মাথায় কতবার যে নিজেকে ধিক্কার জানালো তরুণ, তা সে নিজেই জানে না।

রাস্তায় এসে বিহ্বলভাবে এদিক ওদিক চাইতেই চোখে পড়ল একটা মদের দোকান। কক্ষণো এসব জায়গায় সে ঢোকে না। কিন্তু আজ তার মনের অবস্থা এমনই যে আপনা থেকেই পা দুটো তাকে টেনে নিয়ে গেল সেটার ভেতরে।

একটু মদ পান করে মাথার মধ্যেকার দাপাদাপি যখন থেমে এসেছে, তখন এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলো, জনা দুই মদ্যপ এককোণে বসে আছে বেহুঁশ অবস্থায়।

আর এককোণে বসে যে লোকটা, তাকে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারি বলেই মনে হচ্ছে।

লোকটা এত উত্তেজিত কেন?

দুই

রাসকোল্‌নিকভ সবাইকে এড়িয়ে চলছিল কিছুদিন ধরে—কিন্তু এই মুহূর্তে...মনের এরকম তোলপাড় অবস্থায়...ইচ্ছে হচ্ছিল মানুষের সঙ্গ পেতে। মদের দোকানের এই ধুলো আর বদ গন্ধও তাই ওর কাছে অসহ্য ঠেকেনি। বরং স্বস্তিবোধ করছিল অন্য লোক আশপাশে থাকায়। নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল না। ভয়-ভয় ভাবটাও চলে গেলো।

মদের দোকানের মালিক ওপর থেকে নেমে এসে বসল কাউন্টারে। ফাইফরমাশ খাটার ছোকরা ক'জনও বসে আছে। ওরা প্রত্যেকেই হাই তুলছে আর চেয়ে আছে কোণের উত্তেজিত লোকটার দিকে।

একেই রিটায়ার্ড সরকারি কর্মচারি বলে মনে হয়েছিল রাসকোল্‌নিকভের। জ্বলজ্বল করা অদ্ভুত চোখে লোকটা একদৃষ্টে চেয়ে আছে ওর দিকেই। কোটের বোতাম ছেঁড়া। চোখমুখ ফুলো। হতশ্রী অবস্থা। একগাল খোঁচা খোঁচা দাড়ির জন্যে আরও বিচ্ছিরি লাগছে দেখতে।

আচমকা কথা বলে উঠল লোকটা—'দেখে তো মনে হচ্ছে বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। কি করা হয়?'

অন্য সময়ে এইভাবে গায়ে পড়ে কেউ কথা বললে জবাব দিত না রাসকোল্‌নিকভ। কিন্তু এখন ও নিজেই চায় কথা বলতে।

তাই বললো—'আমি ছাত্র।'

'তাই চেহারায় ধার আছে—নেই শুধু জামাকাপড়ে। তাতে কি হয়েছে! আমার জামাকাপড়ের ছিরি তো দেখতেই পাচ্ছেন।—আমার নাম মারমেলাডভ।'

এরপরেই শুরু হল মারমেলাডভের দীর্ঘ বক্তৃতা। লোকটার প্রথম বউ মারা যাবার পর যাকে বিয়ে করেছিল সে ভদ্রমহিলাও বিধবা। বিধবা হয়েছিল তিনটে বাচ্চা নিয়ে। মারমেলাডভের প্রথম পক্ষের আছে একটি মেয়ে। সোনিয়া তার নাম। বয়স ছিল চোদ্দ—দ্বিতীয় বিয়ের সময়ে। এখন একটু বড় হয়েছে। বাবার চাকরি যাওয়ার পর সৎমায়ের মুখঝামটা খেয়ে ও মেয়েটা রোজগার করতে শুরু

করেছে। নিজে থাকে অন্য জায়গায়। রাতে এসে বাবা আর সৎমাকে টাকাপয়সা দিয়ে যায় সংসার চালানোর জন্যে। সেই টাকাই বাক্স থেকে চুরি করে এনে উড়িয়ে দিয়েছে মারমেলাডভ। পাঁচ দিন বাড়ি ফেরেনি। এখন তো না ফিরলেই নয়।

বাড়ি বেশিদূরে নয়। রাসকোল্‌নিকভই তাকে নিয়ে গেল। চারতলা বাড়ির ওপরতলায় থাকে মারমেলাডভ। অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে উঠবার পর বারান্দায় দাঁড়িয়েই দেখা গেল ঘরের মধ্যেকার দীনহীন অবস্থা। তিনটে বাচ্চার একজন মেঝেতে বসে সোফায় মাথা দিয়ে ঘুমোচ্ছে। অন্য দুজন ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো জামা গায়ে দিয়ে দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কালকে কি খাবে—তাই জানে না। উপোসি রয়েছে ক'দিন ধরেই। ঘরে অন্যমনস্ক হয়ে পায়চারি করছে বছর তিরিশেক বয়সের এক মহিলা।

মারমেলাডভের দ্বিতীয় বউ। ভীষণ রোগা। রোগযন্ত্রণায় সিঁটিয়ে রয়েছে। কাশছে। নিশ্চয় ক্ষয়রোগে ধরেছে।

এ ঘরের কোনো আবরু নেই। ঘরের মধ্যে দিয়েই যেতে হয় আর একটা ঘরে। সেখানে থাকে অন্য ভাড়াটে। তারা হাসছে, কথা বলছে, খেলছে।

মারমেলাডভকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠেছিল তার বউ। মারধরও শুরু করেছিল তক্ষুণি। দৌড়ে এসেছিল ওদিককার ঘরের লোকজন। তারা মজা দেখছিল।

রাসকোল্‌নিকভ নিঃশব্দে পকেট উজাড় করে খুচরো কোপেকগুলো জানলার ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে ফেলে নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। একবারও ভাবল না নিজের কি হবে।

টাকাপয়সা নিয়ে সোনিয়া মেয়েটার ওপর আবার যেন চাপ না পড়ে—এই ভেবেই আনন্দ পেল রাসকোল্‌নিকভ।

তিন

অনেক বেলায় ঘুম ভাঙল রাসকোল্‌নিকভের। শরীর এখনো ম্যাজম্যাজ করছে।

মেজাজ খিঁচড়ে যায় ঘরের চেহারা দেখে। এত ছোট ঘর যে তাকে খুপরি বলাই উচিত। দেওয়ালের হলদে কাগজ ছিঁড়ে ঝুলছে। সোজা হয়ে দাঁড়ালে মনে হয় ছাদে মাথা ঠুকে যাবে।

মাত্র তিনটা টলমলে চেয়ার আর একটা রঙ-করা টেবিল ছাড়া এ ঘরে রয়েছে একটা বদখত সোফা। পুরনো, ছেঁড়া এবং রাসকোল্‌নিকভ তাতে শোয়। ছেঁড়া জামা তাল পাকিয়ে মাথার বালিশ করে নেয়। লেপ নেই বলে ওভারকোট গায়ে দেয়। পোশাক পরেই ঘুমোয়।

রঙ-করা টেবিলটার ওপরে বই আর খাতায় পুরু ধুলো জমে আছে। হাত পড়েনি সেখানে অনেকদিন।

কদাকার সোফার সামনে আর একটা ছোট টেবিল। সেখানে ভাঙা চায়ের পাত্র রেখে দাঁড়ালো ন্যাসটাসিয়া—রাসকোল্‌নিকভের একমাত্র কাজের মেয়ে।

অনেকদিন মাইনে পায়নি ন্যাসটাসিয়া। ফলে ঘর ঝাঁট দেওয়া বন্ধ করেছে। হাঁটলেই ধুলোর মেঘ ওঠে মেঝে থেকে।

টাকার অভাবে হোটেল থেকেও খাবার আনা হয়নি গত পনেরো দিন।

তা সত্ত্বেও আজ চা এনেছে। কেন, তা ন্যাসটাসিয়াই জানে।

হাঁকাহাঁকি শুরু করে দেয় পাত্র নামিয়ে রেখেই—'ওঠো, ওঠো, দশটা বাজল। চা-টা অন্তত খাও, উপোস করেই তো আছো।'

মেজাজটা খিঁচড়ে যেতেই আবার চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল রাসকোল্‌নিকভ। হাঁকডাক শুনে চোখ খুলে বললো—'চা কোত্থেকে এল? বাড়িওলি পাঠালো নাকি?'

'বাড়িওলির বয়ে গেছে,' খানিকটা হলদে চিনি চায়ের পাত্রের পাশে রাখতে রাখতে বললো ন্যাসটাসিয়া—'আমার ঘরের চা।'

পকেট হাতড়ে খানকয়েক কোপেক বের করে ন্যাসটাসিয়ার হাতে দিয়ে বললে রাসকোল্‌নিকভ—'তাহলে একটা রুটি আর একটু মাংস এনে দাও।'

'রুটি না হয় এনে দিচ্ছি। কিন্তু এ সময়ে বাসি মাংস ছাড়া তো কিছু পাবে না। তার চাইতে বরং আমার রান্নাঘরের বাঁধাকপির তরকারি খাও।'

এল রুটি আর তরকারি। খাওয়া শুরু হল রাসকোল্‌নিকভের। সেই সঙ্গে ন্যাসটাসিয়ার কথা—'বাড়িওলি পুলিশকে খবর দিয়েছেন।'

'কেন?'

'টাকা দেবে না, ঘরও ছাড়বে না—পুলিশ তাই এর বিহিত করবে।'

'আচ্ছা বোকা তো! দেখি বুঝিয়ে বলতে হবে বাড়িওলিকে।'

'বোকা তো সবাই—আমিও। তোমার ঘটেই যদি এত বুদ্ধি তো রোজগার নেই কেন? আগে তো ছেলে পড়াতে—'

'এখন অন্য কাজ করছি।'

'কি কাজ?'

'ভাবছি।'

'ভাবলে টাকা রোজগার হবে?'

'কি মুশকিল! জুতো কোথায় যে পড়াতে যাব? তাছাড়া পড়াতে আমার ভালো লাগে না।'

'পেটের খাবারটা তো জুটছিল!'

'অত কম মাইনেতে পোষায় না।'

'তবে কি রাতারাতি টাকার কুমির হাতে চাও?'

'হ্যাঁ, চাই।' অদ্ভুত চোখে তাকায় রাসকোল্‌নিকভ।

'এটা একটা কথা হল? শুনলে ভয় হয়। যাকগে, কাল যখন বেরিয়েছিলে, একটা চিঠি এসেছিল তোমার নামে।'

'চিঠি! আমার নামে? কার চিঠি? কোত্থেকে?'

'অতশত জানি নে। পিয়নকে তিন কোপেক দিয়ে রেখে দিয়েছি চিঠিটা।'

কই সে চিঠি!'

নাসটাসিয়া চিঠিখানা নিয়ে এলো। লিখেছে রাসকোল্‌নিকভের মা। দূর মফস্বল থেকে।

এবার সে চঞ্চল হয়েছে মায়ের চিঠি পেয়ে।

সে ন্যাসটাসিয়াকে হাতে তিনটে কোপেক দিয়ে বলে, 'যাও, এবার সরে পড়ো!'

ন্যাসটাসিয়ার ইচ্ছে ছিল চিঠির কথা শুনবার। তাড়া খেয়ে তাকে বিদেয় হতে হল ঘর থেকে।

খামের ওপর ছোট ছোট মেয়েলি হাতের লেখার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল রাসকোল্‌নিকভ।

মায়ের হাতের লেখা। যে মা তাকে লিখতে শিখিয়েছে, পড়তে শিখিয়েছে, মানুষ করেছে।

খামটায় আলতো একটা চুমু খেয়ে ছিঁড়ে ফেলে রাসকোল্‌নিকভ।

বেশ বড় চিঠি। দু-খানা বড় বড় কাগজে ছোট ছোট অক্ষরে মা লিখেছে—

রোডিয়া,

দু-মাস আগে তোমার চিঠি পেয়েছি। তোমার টাকার দরকার। কিন্তু যে-টাকা আগে পাঠিয়েছিলাম, তা ধার করা টাকা। এতদিনে তা শোধ হল। আবার ধার করছি। দু-একদিনের মধ্যে পাঠাব।

চিঠির জবাব দিতে মন চায়নি হাতে টাকা ছিল না বলে।

আগে পাঠিয়েছিলাম পনেরো রুব্‌ল। এবার পাঠাব কুড়ি-পঁচিশ রুব্‌ল। যে জামিনে পনেরো রুব্‌ল ধার পেয়েছিলাম, সেই একই জামিনে এখন তার ডবল টাকা পাব। কারণ একটা ঘটনায় সমাজে আমাদের মর্যাদা বেড়েছে। এক সঙ্গে তোমার বোন দুনিয়া-র ভবিষ্যৎ জড়িয়ে আছে।

গোড়া থেকে বলি। গত বছর ষাট রুব্‌ল পাঠিয়েছিলাম মনে আছে? তুমি যখন টাকা চেয়ে পাঠালে, তখন আমাদের হাত খালি। ঠিক তখনি দুনিয়া ছেলেমেয়ে পড়ানোর কাজ পেয়ে গেল সিদ্রিগয়লভ সাহেবের বাড়িতে। মাইনে ভালই।

আগাম পাওয়া গেছিল একশ রুব্‌ল। দিয়েছিলেন সিদ্রিগয়লভের স্ত্রী মার্ফা পেত্রোভ্‌না। তাই থেকে তোমাকে পাঠাই ষাট রুব্‌ল—বাকি দিয়ে আমার দেনা শোধ করেছিলাম এখানকার।

বিপদটা এল তারপরেই। সিদ্রিগয়লভ লোকটার বয়স হয়েছে ঠিকই, কথাবার্তাও ভাল, কিন্তু স্বভাবচরিত্র তেমন সুবিধের নয়। দু-দিনেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠল দুনিয়া কিন্তু চাকরি ছাড়তে পারল না। কারণ একশ রুব্‌ল যে আগাম নেওয়া রয়েছে।

ভরসা ছিল মার্ফা-র ওপর। কড়া মহিলা। বেশি খারাপ ব্যবহার নিশ্চয় বরদাস্ত করবেন না।

কিন্তু ঘটনাটা ঘটল ঠিক উল্টো। উনি দুনিয়াকেই ভুল বুঝলেন। সব দোষ নাকি দুনিয়ার। ওকে তাড়ালেন বাড়ি থেকে। শহরময় দুর্নাম ছড়াতে লাগলেন দুনিয়ার নামে। উনি বড়লোক; তাই উনার কথা সবারই বিশ্বাস হল। আমাদের মুখ দেখানো দায় হয়ে দাঁড়াল।

পুরো ব্যাপারটা কিন্তু ঘুরে গেল দুনিয়ার একটা চিঠির জোরে। চিঠিখানা লিখেছিল সিদ্রিগয়লভকে। তাঁর খারাপ ব্যবহারের প্রতিবাদ করে। চিঠি পড়ল গিয়ে মার্ফার হাতে। তিনি ভুল বুঝতে পেরে ভীষণ রেগে গেলেন স্বামীর ওপর। যা ভুল করেছেন, তা শোধরানোর জন্যে শহরের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে এলেন—দুনিয়া নির্দোষ।

এত কথা লিখছি এই জন্যে যে, মার্ফা দিন কয়েক আগে হঠাৎ মারা গেছেন। কিন্তু তিনি আমাদের অবস্থাটা ঘুরিয়ে দিয়ে গেলেন। অনেকেই যেচে এল আমাদের বাড়িতে। এদের মধ্যে ছিলেন লুজিন নামে এক ভদ্রলোক। মার্ফার দূর সম্পর্কের আত্মীয়। নামী উকিল। বড়লোক। সরকারি চাকুরে।

শহরে আমাদের খাতির বেড়েছে এই লুজিনের জন্যে। আলাপ হওয়ার দু-দিন পরেই বিয়ে করতে চেয়েছেন দুনিয়াকে। কারণ, দুনিয়া সুন্দরী, শিক্ষিতা, গরিব। শেষের কারণটা একটা বড় কারণ লুজিনের কাছে। তাঁর মতে, বড়লোকদের উচিত গরিব মেয়ে বিয়ে করা। তাতে ঘরে শান্তি থাকে। বউ স্বামীর বাধ্য থাকে।

কথাটা আমাদের খুব একটা ভাল না লাগলেও ও নিয়ে মাথা ঘামাইনি। ওসব বড়লোকি খেয়াল। মোট কথা, দুনিয়াও পছন্দ করেছে লুজিনকে। লোক ভাল, হাতে টাকা আছে, সমাজে প্রতিপত্তি আছে। আত্মীয়তা গড়ে উঠলে আমাদেরই লাভ।

তুমি আইন পড়ছ শুনে লুজিন বলেছেন—'ভালই হল। পিটার্সবার্গে আমি অফিস খুলছি। রোডিয়াকে আমার সেক্রেটারি করে নেব।'

অর্থাৎ, বিয়ের আগেই তোমার চাকরির কথা পাকা হয়ে গেল। পরে ওঁর অংশীদারও হয়ে যেতে পারো।

যাই হোক, তোমার টাকা পাঠাচ্ছি। ইতিমধ্যে লুজিন পিটার্সবার্গে চলে যাচ্ছেন। অফিস খুলবেন। থাকার ঘর নেবেন। আমাদের থাকবারও

ব্যবস্থা করবেন। তারপর আমরা যাব। বিয়েটা হয়ে গেলেই আমি ফিরে আসব এখানে আর দুনিয়া যাবে ওর স্বামীর কাছে।

আমাদের বাক্সটা লুজিন সাথে নিয়ে যাচ্ছেন। আমরা যাব পরে নিজেদের খরচে, থার্ড ক্লাসে। এমন কিছু খরচ হবে না।

দেখা হবে হপ্তাখানেকের মধ্যেই তোমার ঘরে।

ইতি—

তোমার মা

পলচেরিয়া রাসকোল্‌নিকভ

চিঠি পড়েই মাথা ঘুরে গেল রাসকোল্‌নিকভের।

এ কী করতে চলেছে মা আর বোন! এ যে মহাকিপটের গোলামি করা! লুজিন! ব্যাটাকে চোখে না দেখলেও তার কদর্য মনের পরিচয় চিঠির মধ্যে পেয়ে গেছে রাসকোল্‌নিকভ!

শয়তান! শয়তান! বাক্সটা নিয়ে আসছে যেন কত দয়াই না করছে! কিন্তু যাকে বিয়ে করবে, সে তাঁর মা-কে নিয়ে আসবে নিজের খরচে। বাড়ি থেকে ষাট মাইল দূরের রেলস্টেশনে আসবে মালটানা ঘোড়ার গাড়ির চটে বসে—সাতশো মাইল পথ আসবে ট্রেনের থার্ড ক্লাসে!

খুপরি ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে যায় রাসকোল্‌নিকভ। পাগলের মত ঘুরতে থাকে পথে পথে। মাথার মধ্যে পাক খেতে থাকে দুশ্চিন্তার ঘূর্ণিঝড়!

এ বিয়ে বন্ধ করতেই হবে। প্রবঞ্চক লুজিনকে দুনিয়া বিয়ে করতে চায় কেন সেটা সে বুঝতে পারছে। ভাইয়ের চাকরি হবে। মা সুখে থাকবে—

লুজিন দুনিয়াকে বিয়ে করতে চায় কেন? সে গরিব বলে? আর যখন তখন বায়না করবে না বলে?

ছি! ছি! ছি! এ বিয়ে হতে পারে না—কক্ষণো না।

কিন্তু রাসকোল্‌নিকভের মুরোদই বা কতটুকু? তিন হাজার রুব্‌ল নেই বলে কলেজে যেতে পারছে না, আইন পড়তে পারছে না। পেট চলছে কোনোমতে মায়ের ধার করা টাকায়।

ভাবতে ভাবতে কখন জানি রাস্তার মাঝেই দাঁড়িয়ে গেছিল রাসকোল্‌নিকভ। সম্বিৎ ফিরল আচমকা সপাং করে পিঠে চাবুক পড়ায়—কানে ভেসে এল খটাখট খটাখট ঘোড়ার খুরের আওয়াজ!

চমকে পাশে সরে গেল বটে রাসকোল্‌নিকভ। পাশ দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘোড়ার গাড়িটা। কিন্তু রাস্তার লোক অবাক হয়ে চেয়ে থাকে তার দিকে।

ভাবছে, পাগল না কি লোকটা? রাস্তার মাঝে ওইভাবে কেউ দাঁড়ায়? চাবুক খেয়েও ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে সে।

কে যেন একটা বিশ কোপেক মুদ্রা গুঁজে দিয়ে যায় ওর হাতে। চোখ তুলে তাকায় রাসকোল্‌নিকভ—এক প্রৌঢ়া দয়া করছেন তাকে। সঙ্গে ছোট্ট একটি মেয়ে।

প্রৌঢ়ার চোখে করুণা। কিন্তু রাসকোল্‌নিকভের হাসি পেলো। এত দুঃখেও ইচ্ছে হলো হো-হো করে হেসে ওঠে।

ভিখিরি ভাবা হয়েছে তাকে! তাই এই ভিক্ষে! অথচ সে বড় বংশের ছেলে। শিক্ষিত। আইন পাশ করলেই মোটা রোজগার বাঁধা।

তার দরকার মোটে তিন হাজার রুব্‌ল! যার অভাবে বই বেচতে হয়েছে, কলেজ ছাড়তে হয়েছে। মাত্র তিন হাজার রুব্‌ল! যা পেলে সে প্রতিভার চমক দেখিয়ে এদেশের চেহারা পালটে দেবো আর তাকেই কিনা হাত পেতে বিশ কোপেক ভিক্ষে নিতে হল একজন স্ত্রীলোকের হাত থেকে!

ধিক! ধিক! ধিক! নেভা নদীর সেতুতে দাঁড়িয়েছিল রাসকোল্‌নিকভ। ছুঁড়ে মুদ্রাটা ফেলে দিল নদীর পানিতে।

মনের জ্বালা একটু কমল। হনহনিয়ে নেমে এল সেতু থেকে।

মাথার মধ্যে কিন্তু ঘুরপাক দিচ্ছে একটাই কথা। তিন হাজার রুব্‌ল! তিন হাজার রুব্‌ল! যা পেলে সে আবার পড়াশুনো আরম্ভ করতে পারবে। দারিদ্র্যের অপমানকে কাটিয়ে উঠতে পারবে। কতজনের মঙ্গল করতে পারবে।

লুজিনের মত তো সে টাকার পিশাচ নয়! এই তো গতকালই একটা ঘড়ি বন্ধক দিয়েছিল অ্যালিওনাআইভানোভনাকে। পেয়েছিল মাত্র দেড় রুব্‌ল। তা থেকেই অতগুলো কোপেক দান করেছে মার্মেলাডভকে।

ঘড়ি বন্ধক রেখে পাওয়া টাকা! পারবে কেউ দান করতে?

তিন হাজার রুব্‌ল হাতে পেলে সে যে কি করবে—

মাথা নিচু করে হাঁটতে থাকে আর আবোলতাবোল ভাবতে থাকে। হঠাৎ চোখ তুলেই থমকে যায় রাসকোল্‌নিকভ।

সামনেই রাজুমিখিনের বাড়ি। তাঁরা একই ক্লাসের বন্ধু। একই অবস্থা দু'জনের। টাকার অভাবে পড়াশুনো শিকেয় উঠেছে।

কিন্তু কেউ কাউকে তা মুখ ফুটে বলে না। অভাব থাকতে পারে—আত্মসম্মানও তো আছে। দেখা হলে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। এসেই যখন পড়েছে, তখন দেখাটাও করে যাওয়া যাক বন্ধুর সঙ্গে।

রাজুমিখিন কিন্তু ওকে দেখেই ভূত দেখার মত চমকে উঠল। তার ঘরের অবস্থাও রাসকোল্‌নিকভের ঘরের মত। কম আলোয় ঘাড় হেঁটে করে কি যেন লিখছিল সে।

রাসকোল্‌নিকভকে সামনে দেখেই বলে উঠলো বিড়বিড় করে—'কী আশ্চর্য! এই অবস্থা হয়েছে তোমার!'

তারপরেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললো—'আমার একটা উপকার করবে, রাসকোল্‌নিকভ? একজন প্রকাশক আমাকে ছ রুব্‌ল আগাম দিয়েছেন—আর

জার্মান থেকে রুশ ভাষায় অনুবাদের জন্যে এই বইগুলো দিয়েছেন। জার্মানটা তো আমি ভাল জানি না—বড্ড দেরি হচ্ছে। অর্ধেক অনুবাদ তুমি করে দাও—এই নাও বই আর এই নাও তিন রুব্‌ল।'

বই আর টাকা নিয়ে পথে নেমে এসেছিল রাসকোল্‌নিকভ। তারপর আবার কি মনে করে ফিরে গিয়ে ফিরিয়ে দিল সবকিছুই।

হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইল রাজুমিখিন।

রাস্তায় নেমে এল রাসকোল্‌নিকভ। হাঁটছে আনমনাভাবে। হঠাৎ কানে ভেসে এল এই কথাগুলো—

'কাল সন্ধ্যেবেলা। ছ'টা থেকে সাতটার মধ্যে যেও। অনেক কাপড় কিনবে লোকটা।'

'যাব।'

শেষ কথাটা বলল লিজাভেটা। বলল এক ফিরিওলাকে।

লিজাভেটাকে চেনে রাসকোল্‌নিকভ। অ্যালিওনাআইভানোভনা-র বোন—যার কাছে সে কালকে ঘড়ি বন্ধক দিয়ে এসেছে।

কথাগুলো গেঁথে গেল মাথার মধ্যে।

তিন হাজার রুব্‌ল রোজগারের উপায়টাও ঝিলিক দিয়ে উঠল মগজে!

চার

বুড়ির ঘরে ছটা থেকে সাতটার মধ্যে তাহলে বুড়ি ছাড়া আর কেউ থাকবে না!

সেখানে আছে লোহার সিন্দুক—ভেতরের ঘরে। রাসকোল্‌নিকভ নিজে অবশ্য দেখেনি, দেখেছে শুধু চাবির গোছাটা। থাকে বুড়ির ডান পকেটে। একটা চাবি বড়—খাঁজকাটা। নিশ্চয় সিন্দুকের।

তিন হাজার রুব্‌ল থাকবে না সিন্দুকে? নিশ্চয় থাকবে। আইন কলেজের অভাবী ছেলেরা ওখান থেকেই ধার নেয়। হাজার হাজার রুব্‌ল ধার নেবার মত লোকও আসে।

বুড়ির একটাই বোন। লিজাভেটা। কাপড় ফেরি করে। তখন বুড়ি একলা থাকে।

থাকবে কালকেও। সন্ধ্যে ছটা থেকে সাতটার মধ্যে।

ফ্ল্যাটটা অবশ্য পাঁচতলায়। তাতে বয়ে গেল বুড়ির। টাকার দরকার পড়লে লোকে ওখানেই ছোটে।

আইন? সে তো বড়লোকদের হাতের অস্ত্র। আইনকে পায়ের তলায় রাখে বড়লোকরা। আইন কিন্তু পায়ের তলায় রাখে গরিবদের।

আইন! নেপোলিয়ন কি আইন মেনেছিলেন? লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছেন। লেনা, অস্টারলিজ, ওয়াটারলুতে রক্তের সমুদ্র বইয়েছেন। মিশরে বিশাল সেনাবাহিনী ফেলে চলে এসেছেন—যারা না খেয়ে মরে গেছে। রাশিয়ায় তার চেয়েও বেশি সৈন্যদের শীতে কেঁপে মরে যেতে হয়েছে।

তবুও তাঁকে খুনী বলা হয়নি। উল্টো মহামানব বলে শ্রদ্ধা করা হয়েছে।

অপরাধ নিয়ে একটা প্রবন্ধও লিখেছিল রাসকোল্‌নিকভ। কিন্তু ছাপবার জন্যে যে কাগজে পাঠিয়েছিল, সে কাগজটা গেল উঠে। প্রবন্ধ তো ছাপা হলই না—ফেরৎও দিল না।

নেপোলিয়ন! অসাধারণ মানুষ নেপোলিয়ন! মানুষ খুন করা যে বেআইনী, একথা আইনবিদ্‌রা বললে কি তিনি যুদ্ধ বন্ধ রাখবেন?

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল রাসকোল্‌নিকভ।

একে তো পেটভরে খাওয়া হয়নি কতদিন, তার ওপর পথে পথে টো-টো করে ঘোরা—শরীর অবসন্ন তো হবেই। তাই ঘুমে কাদা হয়ে গেছিল রাসকোল্‌নিকভ।

সকালে একবার বেরিয়েছিল। যেন নেশায় ঘোরে ঘুরপাক দিয়েছিল রাস্তায় রাস্তায়। ফিরে এসে শুতে না শুতেই ঘুম।

ঘুম আর যায় না চোখ থেকে। ঘুম-ঘুম চোখেই একবার মনে হয়েছিল, কি যেন আজ করতে হবে—এখুনি ওঠা দরকার, কিন্তু শরীরটা যে বাগে নেই। কাজটা কি, তা ভেবে ওঠার আগেই আবার পাশ ফিরে ঘুমে অচেতন হয়ে গেল রাসকোল্‌নিকভ।

ঘুমের ঘোরেই হঠাৎ শুনল, কে যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে নিচের দালানে—'কি মুশকিল! যাবি কখন? পাঁচটা যে বেজে গেল!'

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো রাসকোল্‌নিকভ।

পাঁচটা বাজে! পাঁচটা! তাহলে তো হাতে সময় খুবই কম! ছটা থেকে সাতটার মধ্যে যে বুড়ির বাড়িতে রয়েছে মস্ত কাজ!

তিন হাজার রুব্‌ল রোজগারের কাজ। আজকেই যেতে হবে। আবার কবে যে সে ঘরে বুড়ি আবার একলা থাকবে তা জানবে কি করে রাসকোল্‌নিকভ?

যাবেই সে—আজকেই। কিন্তু আয়োজন তো কিছুই হয়নি! পিস্তল সে নেবে না। ওতে বড় আওয়াজ হয়, কাজ সারতে হবে নিঃশব্দে। পিস্তল তার নেইও। থাকলেও নিত না।

কুড়োলটা নিতে হবে। আছে ন্যাসটাসিয়ার রান্নাঘরে। কিন্তু কুড়োল হাতে তো রাস্তায় বেরোনো যায় না। লোকের চোখে পড়বেই। সুতরাং...

বালিশের তলা থেকে একটা ছেঁড়া জামা টেনে নিল রাসকোল্‌নিকভ। একটা ফালি ছিঁড়ে নিয়ে পাকিয়ে দড়ি করে নিল ঝটপট। ওভারকোটের হাতার মধ্যে

গলিয়ে ফাঁস করে নিল ঝড়ের বেগে হাত চালিয়ে। কুড়োল আটকে থাকবে সেখানে। বগলে থাকবে একটা ফাঁস। কুড়োলের মাথা আটকে রাখার জন্যে।

চমৎকার ফন্দী! অভিনব কৌশল! নিজেই নিজের তারিফ করে রাসকোল্‌নিকভ। ফাঁস বানিয়ে নেয় ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে খুশি খুশি মনে।

এর পরের কাজটা আরও অদ্ভুত। সোফার তলা হাতড়ে বের করে একটা চৌকো কাঠ, আর একটা প্রায় একই মাপের টিন। টিন মুড়লো কাঠের গায়ে, সুতো দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধল বারবার—যাতে চট করে খোলা না যায়। তার ওপর জড়ালো কাগজ।

ছটা বেজে গেল বোধহয়। এবার যোগাড় করতে হবে কুড়োলখানা।

তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচের তলায়। রান্নাঘরে এখন ন্যাসটাসিয়া নাও থাকতে পারে...

ঢুকতে গিয়েই থমকে গেল। ন্যাসটাসিয়া রয়েছে। দরজার দিকে পেছন ফিরে একমনে কাজ করছে।

গেল সব ভেস্তে! এখন উপায়? ছটা বেজে গেল—অথচ এখনও হাতিয়ার সংগ্রহ হল না!

এখানে দাঁড়িয়ে থাকাটাও বিপদ। কখন পেছন ফিরবে ন্যাসটাসিয়া—শুরু হবে বকবকানি।

পলকে সরে এল রাসকোল্‌নিকভ। মাথার মধ্যে চিন্তার তুফান ছুটলো। তিন হাজার রুব্‌ল রোজগার আর হল না। খতম হয়ে গেল পরিকল্পনা—

শুধু একটা কুড়োলের অভাবে!

কি করবে এখন? রান্নাঘরের কাছে দাঁড়িয়ে থাকলেও তো লোকের সন্দেহ হবে। ঘরে ফিরে যেতেও মন চাইছে না। রাস্তায় টো-টো করতেও ইচ্ছে হচ্ছে না মনভর্তি হতাশা নিয়ে...

সদর দরজার কাছে গিয়ে ভাবছিল কি করবে...

এভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা দারোয়ান দেখছে না তো? তাকিয়ে দেখলো সে দারোয়ানের ঘরের দিকে...

সে নেই ঘরে। নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও গেছে। ঘরে তালা দিয়ে যায়নি।

ঘর অন্ধকার। কিন্তু বেঞ্চির নিচে চক্‌চক্‌ করছে ওটা কী? বুকটা ধড়াস করে ওঠে রাসকোল্‌নিকভের!

এদিকে ওদিকে চেয়েই ঢুকে পড়ল ঘরে। টেনে বের করল চকচকে জিনিসটা।

একটা কুড়োল!

চোখের নিমেষে ঢুকিয়ে নিল ওভারকোটের হাতায়, ঝুলিয়ে নিল বগলের ফাঁসটাতে। দ্রুত বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

না। কেউ নেই আশেপাশে। কেউ তাকে দেখেনি দারোয়ানের ঘরে ঢুকতে আর বেরোতে।

শয়তান আছে তার সঙ্গে। ভয় কী ? ঠিক দরকারের সময় কাজের জিনিস জুটিয়ে দিয়েছে হাতের কাছে। যার কেউ নেই, তার শয়তান আছে। নরকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এক পায়ে খাড়া শয়তান স্বয়ং।

রাস্তায় নেমে হনহনিয়ে যেতে যেতে এক দোকানে ঘড়ি দেখল রাসকোল্‌নিকভ।

সাতটা বেজে দশ মিনিট!

দেরি হয়ে গেছে—খুবই! কিন্তু তাই বলে সোজা পথে গেলে তো চলবে না। যে পথে ঘড়ি বন্ধক দিতে গেছিল, সেপথে না গিয়ে যেতে হবে ঘুরপথে। সাবধানের মার নেই।

তাই সে চলল ইউসুফভ বাগানের মধ্যে দিয়ে।

বড় ফোয়ারাটার দিকে তাকিয়ে মনে হল—হাওয়া ঠাণ্ডা রাখার জন্যে সব বাগানেই ফোয়ারা রাখা দরকার।

মিহয়লাভস্কি প্রাসাদ পর্যন্ত যদি এ বাগানকে বাড়িয়ে নেওয়া হয় কেমন হয় তাহলে ? খুবই ভাল হয়। শহরের এই অংশের চেহারা ফিরে যাবে—শহরবাসীদের স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে...

পরক্ষণেই অন্য এক সমস্যা নিয়ে মশগুল হল ওর মগজ—

শহরের একটা দিকে বাগান-বাগিচা কিচ্ছু নেই। বড় নোংরা। অথচ লোকগুলো ওইখানেই গাদাগাদি করে থাকতে চায় কেন ?

কাছেই একটা ঘড়িতে ঢং করে একটা ঘণ্টা বাজতেই চমকে ওঠে রাসকোল্‌নিকভ। সাড়ে সাতটা বেজে গেল ?

এলোমেলো এত চিন্তা মাথায় আসছেই বা কি করে ? ফাঁসির আগে নাকি এরকম হয়। হাজার চিন্তা মগজকে ছেয়ে ফেলে।

সত্যিই কি সাড়ে সাতটা বাজল ? এ ঘড়িটা ঘোড়ার মত চলছে নিশ্চয়।

এসে গেছে বাড়িটা। এখানেও ভাগ্য মুখ তুলে চেয়েছে। অথবা, শয়তান সহায় হয়েছে। খড়-বোঝাই একটা গাড়ি ঢুকছিল ফটক দিয়ে। ডান দিকে দারোয়ান ব্যস্ত চাকর-মজুরদের নিয়ে। বাঁ দিকে কেউ নেই। সেই দিক দিয়েই দেয়াল আর গাড়ির মাঝখানে থেকে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল রাসকোল্‌নিকভ। কেউ দেখতেও পেল না।

ভেতরে ঢুকেই ডাইনের সরু সিঁড়িটায় লাফিয়ে উঠেই বাঁচল হাঁফ ছেড়ে।

শয়তান! শয়তান! শয়তান ছাড়া এত সাহায্য কে করবে তাকে ?

কিন্তু যা বুক ধড়ফড় করছে! হাত দিয়ে একবার খামচেও ধরল বুকখানা। অথচ কেউ ওকে দেখেনি।

কুড়োলটা ? আছে ঠিক জায়গায়।

শুরু হল সিঁড়ি বেয়ে পা টিপে-টিপে ওঠা। ঘনঘন দেখতে লাগল ডাইনে বাঁয়ে। না, কেউ দেখছে না—সব দরজাই বন্ধ।

দোতলার একটা ফ্ল্যাটের দরজা খোলা। রঙ-মিস্ত্রীরা কাজ করছে সেখানে।

রাজকোল্‌নিকভকে দেখেনি তারা। কিন্তু খুঁতখুঁত করতে থাকে মনটা। তিনতলায় উঠে একটু দাঁড়ায়। রঙ-মিস্ত্রীগুলো না থাকলেই ভাল হত। গুটিগুটি আবার উঠতে থাকে সিঁড়ি বেয়ে। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে পাঁচতলায় উঠে আবার থমকে দাঁড়ায়।

সিঁড়িতে কেউ নেই। কান পাতে বুড়ির দরজায়। ঘরের মধ্যেও কোনো আওয়াজ নেই।

কুড়োলটা ? ঠিকই ঝুলছে বগলের ফাঁকে।

মুখখানা কি ফ্যাকাশে মনে হচ্ছে ? একটু চঞ্চল ? দেখলে বুড়ির সন্দেহ হবে না তো ?

আর একটু দাঁড়ালে হয় না ? বুকের ধড়াস ধড়াস ভাবটা যাতে একটু কমে ?

ধুত্তোর! বুকের হাতুড়ি-পেটা তো কমছে না। এ যে বেড়েই চলেছে! কাঁহাতক এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে রাসকোল্‌নিকভ ? অসহ্য! হাত বাড়িয়ে বাজিয়ে দেয় বুড়ির দরজার ঘণ্টা।

জবাব নেই।

আধমিনিট পরে আবার বাজায়—এবার আরও জোরে। এবারও কোনো সাড়া নেই।

বড় ধুরন্ধর এই বুড়ি। আছে ভেতরেই। একা, তাই ভয় পাচ্ছে।

বুড়ির এই সাবধানী স্বভাবটা আগেও দেখেছে রাসকোল্‌নিকভ। তাই কান পাতে দরজায়—নিঃশব্দে।

ভেতরের তালার ওপর কে যেন হাত রাখল। খুব সাবধানে। দরজার একদম কাছে খসখস আওয়াজও শোনা গেল। জামাকাপড়ের আওয়াজ।

নিশ্চয় হুঁশিয়ার বুড়ি দাঁড়িয়ে আছে পাল্লার ওপিঠে। এপিঠে দাঁড়িয়ে রাসকোল্‌নিকভ।

রাগে গা রি-রি করে ওঠে রাসকোল্‌নিকভের।

সঙ্গে সঙ্গে কুচুটে বুদ্ধিটাও মাথায় আসে। ইচ্ছে করেই একটু নড়াচড়ার আওয়াজ করে। আগডুমবাগডুম কথাও বলে খাটো গলায়। বুড়ি যেন বোঝে, কেউ দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। লুকোছাপা করছে না।

নিজের এই বুদ্ধির বহর নিয়ে পরে কিন্তু অবাক হয়েছিল রাসকোল্‌নিকভ। মগজ এত খোলতাই হল কি করে সেই সময়ে ? সবই তো গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। অসাড় হয়ে যাচ্ছিল শরীরটা!

খুট করে একটা আওয়াজ হল ভেতরে। ছিটকিনি খোলার আওয়াজ!

সামান্য ফাঁক হল পাল্লা দুটো। দেখা যাচ্ছে সন্দেহভরা চোখের চাহনি।

এই হল বুড়ির স্বভাব। প্রতিবারই তাকায় এইভাবে।

গুলিয়ে গেল রাসকোল্‌নিকভের মাথাটা। পাছে তার মুখের চেহারা দেখে ভয়ের চোটে দরজা বন্ধ করে দেয় বুড়ি, তাই নিজের দিকে হ্যাঁচকা টান মেরে বসল পাল্লায়।

ফলটা হল উল্টো। সত্যিই ঘাবড়ে গিয়ে শক্ত করে পাল্লা ধরে রইল বুড়ি।

পারবে কেন রাসকোল্‌নিকভের সঙ্গে? আবার একটা হ্যাঁচকা টান মারতেই পাল্লা তো খুলে গেলই; নিজেও তাল সামলাতে না পেরে ছিটকে গেল সিঁড়ির দিকে।

বুড়িও ছিটকে এসেছে চৌকাঠের এপারে। পথ জুড়ে দাঁড়িয়েছে রাসকোল্‌-নিকভের—সরে যায়নি।

মরিয়া হয়ে গেল রাসকোল্‌নিকভ। হুড়মুড় করে এসে পড়ল বুড়ির গায়ের ওপর।

বুড়ি তখনও সরে দাঁড়াল না। কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারল না। চোখ বড় বড় করে শুধু চেয়ে রইল রাসকোল্‌নিকভের দিকে। চোখে আতঙ্ক।

'আদাব, অ্যালিওনাআইভানোভনা,' তড়বড় করে কথা বলে ওঠে রাসকোল্‌নিকভ। তখনি বোঝে, গলা ভেঙে গেছে তার—'এসেছিলাম একটা জিনিস নিয়ে—কিন্তু এখানে যা অন্ধকার—ভেতরে চলুন।'

বলেই ঝট করে বুড়ির পাশ দিয়ে ঢুকে গেল ঘরে। বুড়ি হ্যাঁ কি না বলার আগেই।

পেছন পেছন ছুটে এসেই চেঁচাতে লাগলো বুড়ি—'বলি ব্যাপারটা কী? এসব কি হচ্ছে? কী চাই?'

'সিগারেটের কৌটোটা বন্ধক দিতে চাই। সেদিন যেটার কথা বলে গেছিলাম,' বলতে বলতে পকেট থেকে টিন আর কাগজ জড়ানো কাঠের কৌটোটা বের করে রাসকোল্‌নিকভ।

জিনিসটার দিকে এক পলক চেয়ে রাসকোল্‌নিকভের চোখে চোখে চেয়ে রইল বুড়ি। স্থির চাহনি। ওর মনের ভেতর পর্যন্ত যেন দেখতে পাচ্ছে। ঠোঁটেও বুঝি বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠছে।

গাঁ শিরশির করে ওঠে রাসকোল্‌নিকভের। বুড়ি কি ওর কুমতলব ধরে ফেলেছে?

কুটিল ওই চোখের মধ্যে জাদু আছে নাকি? পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে রাসকোল্‌নিকভের।

তেড়ে উঠেই তাই বলেছিল—'দেখছেন কি অমন প্যাটপ্যাট করে ? নিতে হয় নিন—নইলে আমি যাই।'

কড়া গলায় ধমক শুনেই বুড়ি কিন্তু সহজ হয়ে গেল। মনের মধ্যে প্যাঁচ নিয়ে এলে খদ্দের কখনো তেড়েমেড়ে কথা বলে না।

বললো 'অত ছটফট করছ কেন ? কি আছে প্যাকেটে ?'

'রুপোর সেই সিগারেট কেস। সেদিন বলে গেছিলাম, মনে নেই ?'

'হাত কাঁপছে কেন ? শীতে না জ্বরে ? মুখ তো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে দেখছি।'

'জ্বরে! জ্বরে কাঁপছি! ফ্যাকাশে মেরে গেছি পেটে খাবার নেই বলে!' আরও বাজখাঁই গলায় বলে ওঠে রাসকোল্‌নিকভ।

এতক্ষণে বুড়ির সন্দেহ যায়। অভাবে না পড়লে এরকম বিকটভাবে কেউ চেঁচায় না। হাত বাড়িয়ে নেয় কাগজে মোড়া প্যাকেটটা।

'কি আছে এতে ?'

'বললাম তো রুপোর সিগারেট কেস।'

'রুপো! মনে তো হচ্ছে না—ইস্! এভাবে কেউ জড়ায়!' বলতে বলতে জানালার দিকে এগোয় বুড়ি, আলোয় দেখবে বলে।

দাঁড়িয়ে রইল রাসকোল্‌নিকভ। বুড়ি গজগজ করতে করতে যাচ্ছে জানালার দিকে। রাসকোল্‌নিকভ তখন কোটের বোতাম খুলে ফাঁস থেকে কুড়োলের ফলা টেনে বের করে। হাতলটা ধরে ডান মুঠোয়।

হাতে শক্তি নেই কেন ? হাত ফসকে টং করে কুড়োল পড়ে না যায়।

মাথা ঘুরছে। চোখে ধোঁয়া দেখছে।

'কী জ্বালা! কী জ্বালা! এভাবে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কেউ বাঁধে ?' গজগজ করতে করতে জানালার দিক থেকে ফিরে আসছে বুড়ি।

কুড়োলখানা মাথার ওপর তুলল রাসকোল্‌নিকভ। জ্ঞান ছিল কি সেই সময়ে ? খুনের চেষ্টায় কি সব উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছে ?

মনে হয় তাই হয়েছিলো; তাই কুড়োলখানা নেমে এল উল্টো হয়ে।

ফলা নয়—কুড়োলের ভোঁতা দিকটা সজোরে পড়ল বুড়ির মাথায়।

আর সঙ্গে সঙ্গে হুঁশ ফিরে এল রাসকোল্‌নিকভের। ঘোর কেটে গেল চোখের নিমেষে। মাথাচাড়া দিল খুন করার ইচ্ছেটা। সেই সঙ্গে ফিরে এল হাতের শক্তি।

মাথার ওপর চোট খেয়েই বুড়ি কিন্তু অস্ফুট একটা আওয়াজ করে গড়িয়ে পড়েছে মেঝের ওপর। উঁচু করে ধরেছে হাত দু'খানা। কাগজের প্যাকেট তখনও তার হাতে।

বেঁটে বুড়ি। মাথার পাতলা চুল ইঁদুরের ল্যাজের মত বিনুনি পাকানো। শিঙের চিরুনি দিয়ে আটকানো।

কুড়োলের উল্টো পিঠ দিয়ে আবার একটা ঘা মারে রাসকোল্‌নিকভ। তার পরে আর একটা।

খুলি ফেটে গেছে। হুড়হুড় করে রক্ত বেরোচ্ছে।

চিৎ হয়ে বুড়ি পড়ে গেল মেঝেতে। নিচু হয়ে মুখখানা দেখে নিল রাসকোল্‌নিকভ। হ্যাঁ, মারা গেছে। চোখ দুটো কোটর থেকে যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কুড়োল নামিয়ে রাখল রাসকোল্‌নিকভ—বুড়ির পাশে, মেঝের ওপর।

এবার দরকার চাবির গোছা। যেটা থাকে বুড়ির ডান পকেটে।

হ্যাঁ, চাবি সেখানেই আছে। টেনে বার করল রাসকোল্‌নিকভ। হাত কাঁপছে এখনও কিন্তু বেসামাল নয়। নিজের হাতে বা জামাকাপড়ে যাতে রক্ত লেগে না যায়, সে ব্যাপারে হুঁশিয়ার সে। চাবি এখন ওর হাতে। লোহার রিঙে ঝুলছে অনেকগুলো চাবি।

ছুটে শোবার ঘরে ঢুকল রাসকোল্‌নিকভ।

ছোট্ট ঘর। দেয়ালে যিশু আর সাধুদের ছবি। চাদর ঢাকা একটা পরিষ্কার বিছানা। সিল্কের ওয়াড় পরানো লেপ।

দেরাজটা রয়েছে দেওয়ালের গায়ে। কিন্তু চাবি লাগাতে গিয়েই সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল রাসকোল্‌নিকভের। চাবির ফুটোয় চাবি আর লাগে না! ইচ্ছে হচ্ছে দৌড়ে পালায়। পরমুহূর্তেই হেসে ওঠে ফিক করে—এখন কি পালানো যায়?

তারপরেই ভয়ানক আতঙ্ক দেখা দিল তার মনের মধ্যে। হঠাৎ যদি বুড়ি এখন চেঁচিয়ে ওঠে? হয়তো মরেনি—মরার ভান করে পড়ে আছে!

চাবি ঝুলতে লাগল দেরাজের গায়ে। হন্তদন্ত হয়ে সামনের ঘরে ফিরে এল রাসকোল্‌নিকভ। খপ্‌ করে কুড়োলখানা তুলে নিয়ে আর এক ঘা কষিয়ে দিতে গিয়েই...দেখল, বুড়ি সত্যিই মরেছে!

খুলি ভেঙে হাড় ঢুকে গেছে ভেতরে। আঙুল দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতেও যাচ্ছিল... সামলে নিল নিজেকে। এত রক্ত!...গা বমি-বমি করছে রাসকোল্‌নিকভের। বুড়ির গলায় একগাছা সুতো রয়েছে না? কিসের সুতো?

টেনে ছিঁড়তে গেল রাসকোল্‌নিকভ। পারল না। খুবই শক্ত সুতো। তার ওপর রক্তে ভিজে গেছে। টেনে বের করাও যাচ্ছে না। জামার মধ্যে কি একটা জিনিসে যেন আটকে যাচ্ছে।

শেষমেষ কুড়োল দিয়েই কাটতে হল সুতোটা।

টান মারতেই হাতে উঠে এল সুতোয় বাঁধা একটা টাকার থলি।

থলিটা নিজের পকেটে রাখল রাসকোল্‌নিকভ। কত টাকা ভেতরে আছে, তা পরে দেখবে। এখন তার দু'হাত রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে।

শোবার ঘরে ফিরে এল। হাতে কুড়োল। একটার পর একটা চাবি লাগিয়ে গেল দেরাজের ফুটোয়। কিন্তু লাগল না কোনোটাই। তবুও একই চাবি বারবার লাগিয়ে যাচ্ছে। মাথা তার ঠিক নেই।

হঠাৎ বড় চাবিটার দিকে খেয়াল হল, এটা অন্য কিছুর চাবি নয় তো? নাকি সিন্দুকের?

খাটের তলায় উঁকি দিতেই দেখা গেল সিন্দুকটা।

টেনে বের করল রাসকোল্‌নিকভ। বেশ বড় সিন্দুক। লম্বায় গজ খানেক। ডালাটা ধনুকের মত বাঁকানো। লাল চামড়া দিয়ে মোড়া। তার ওপরে লোহার পেরেক বসানো।

খাঁজকাটা বড় চাবিটা লেগে গেল সিন্দুকে। ডালা খুলতেই দেখা গেল, বেশ কিছু জামাকাপড়। ওপরে রয়েছে একটা লাল কোট।

হাতের রক্ত এই লাল কোটেই মুছে নিল রাসকোল্‌নিকভ।

মনে মনে বললো—'লাল কোটে লাল রক্ত-চোখে পড়বে না।'

জামাকাপড়ের নিচে রয়েছে সোনার বন্ধকী জিনিস—ঘড়ি, ব্রেসলেট, হার, ইয়ার-রিং, পিন—আরও কত কী!

সেগুলো তুলে নিয়ে প্যান্ট আর কোটের পকেটে ঢুকিয়ে নেয় রাসকোল্‌নিকভ। হয়তো তারপরও কিছু থেকে গেল কিন্তু দেখবার সময় কই?

পাশের ঘরে একটা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। বুড়ি মরে পড়ে আছে যেখানে—শব্দটা আসছে মনে হয় সেখান থেকেই।

ঠিক যেন পায়ের শব্দ! তারপরেই কে যেন কেঁদে উঠল! ব্যস, আর কোনো শব্দ নেই। যেন কবরের নিস্তব্ধতা!

কুড়োলটা নিয়ে লাফিয়ে উঠে ধেয়ে গেল রাসকোল্‌নিকভ।

ঘরে দাঁড়িয়ে লিজাভেটা, বুড়ির বোন। বগলে এক বান্ডিল কাপড়। মুখ সাদা। কাঁদতেও পারছে না।

রাসকোল্‌নিকভকে দেখেই সে কাঁপতে শুরু করেছে। মুখে বিভীষিকা ফুটে উঠেছে। একহাত উঁচু করে চেঁচাতে গেল কিন্তু আওয়াজ বেরোলো না গলা তার দিয়ে।

পিছিয়ে যাচ্ছে সে একটু একটু করে। ভয়ার্ত চোখ তার রাসকোল্‌নিকভের দিকে। সে আসছে! হাতের কুড়োল মাথার ওপর তুলে সে আসছে!

লিজাভেটার মুখে করুণ আকুতি। যেন অসহায় শিশু।

কুড়োল নেমে এল তার মাথায়। এবার ফলার দিকটা। খুলি চিরে দু-ফাঁক হয়ে গেল তক্ষুণি। লুটিয়ে পড়ল লিজাভেটা।

আর গুলিয়ে গেল রাসকোল্‌নিকভের মাথা। এই দ্বিতীয় খুনটা সে করতে চায় নি...

কাপড়ের বান্ডিলটা মেঝে থেকে তুলে নিয়েই ফেলে দিল আছড়ে। ছুটল বাইরের দরজার দিকে।

পালাতে চেয়েছিল রাসকোল্‌নিকভ। ভয়ে আর ঘৃণায়। ঘৃণাটা নিজের ওপর। লিজাভেটাকে তো সে খুন করতে চায়নি! ডবল খুন করে ভয়ও পেয়েছে খুব। বুদ্ধিসুদ্ধি সব গুলিয়ে যাচ্ছে। সিন্দুকের কাছে যেতেও আর মন চাইছে না।

মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল বলেই দরজার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে ছিল রাসকোল্‌নিকভ। এই সময়ে চোখ গেল রান্নাঘরের দিকে। এক বালতি পানি রয়েছে সেখানে।

এই তো চাই! হাতের রক্ত আর কুড়োলের রক্ত ধুয়ে নেওয়া যাবে বালতির পানি দিয়ে। সাবানও পেয়ে গেল সেখানে। আগে পরিষ্কার করল হাতের রক্ত—বালতিতে হাত ডুবিয়ে।

তারপর শুরু হল কুড়োল ধোয়া। খুব খুঁটিয়ে বাঁট থেকে, ফলা থেকে সমস্ত রক্ত ঘষে ঘষে তুলতেই গেল মিনিট তিনেক।

রান্নাঘরের দড়িতে কাপড় শুকোচ্ছিল। তাই দিয়ে মুছল হাত আর কুড়োল।

এতক্ষণে ঠাণ্ডা হল প্রাণটা! কুড়োল ঝুলিয়ে নিল বগলের ফাঁসে।

তারপরেই মনে হল, আচ্ছা, কোট প্যান্ট বুটে রক্ত লেগে নেই তো?

ভালো করে তাকিয়ে রক্তের খোঁজে তন্ময় হয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ।

না, কোট-প্যান্টে লাগেনি বটে; তবে বুটে রয়েছে রক্তের ছিটে।

সঙ্গে সঙ্গে ন্যাকড়া ভিজিয়ে ঘষে ঘষে তুলে ফেলল রক্তের দাগ। তবুও খুঁতখুঁত করছে মনটা। জুতো থেকে রক্ত গেল বটে—কিন্তু কোট-প্যান্টে নিশ্চয় লেগেছে রক্ত।

আবার তীক্ষ্ণ চোখে দেখল কোট আর প্যান্ট। দেখছে তো দেখছেই...

হঠাৎ মনে হল, একী! ডবল খুন করে এখনও দাঁড়িয়ে আছে! এখুনি তার পালানো উচিত ঘর ছেড়ে।

ধড়মড়িয়ে দরজার দিকে ছুটে গিয়েই আঁৎকে উঠল দরজা খোলা রয়েছে দেখে!

পাল্লার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সিঁড়ি।

কী সর্বনাশ! দরজা খোলা রেখেই এতক্ষণ ধরে খুনখারাবি আর সিন্দুক লুট করে গেছে সে!

দরজা খোলা না থাকলে তো লিজাভেটা হুট করে ঘরে ঢুকেতে পারত না আর খুনও হত না! এত আহাম্মক রাসকোল্‌নিকভ!

দড়াম করে পাল্লা বন্ধ করে দিয়ে ছিটকিনি তুলে দিল তক্ষুণি।

তারপরেই মনে হল—কি করছে সে? এখন তো পালানো দরকার—দরজা বন্ধ করছে কেন?

সঙ্গে সঙ্গে ছিটকিনি খুলে, পাল্লা ঠেলে মিটমিট করে চেয়ে রইল সিঁড়ির দিকে।

কান খাড়া করে শুনছে। কারা যেন নিচতলায় কথা কাটাকাটি করছে। দু'টো লোক।

জ্বালাতন! পালানোর সময়ে একী ফ্যাসাদ?

বেশ কিছুক্ষণ পরে গলাবাজি বন্ধ হল লোক দু'টোর। নিশ্চিন্ত হয়ে যেই দরজা খুলে বেরোতে যাবে রাসকোল্‌নিকভ, অমনি দড়াম করে খুলে গেল নিচের একটা দরজা!

কে যেন বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ফুর্তিতে শিস দিতে দিতে নামছে সিঁড়ি দিয়ে।

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রাসকোল্‌নিকভ। নেমে গেছে লোকটা। কোথাও আর কোনো শব্দ নেই। এইবার চম্পট দেওয়া যাক।

দরজা খুলে বাইরে বেরোতে না বেরোতেই বুকটা ধড়াস করে ওঠে রাসকোল্‌নিকভের!

কে যেন উঠে আসছে সিঁড়ি বেয়ে!

না...না...এখন নামা যাবে না। সিঁড়িতেই মুখোমুখি হয়ে যাবে!

পায়ের শব্দ উঠে এল দোতলায়।

তিনতলায়।

চারতলায়।

তড়াক করে পিছিয়ে এসে ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিলো রাসকোল্‌নিকভ।

পায়ের শব্দ উঠে এল পাঁচতলায়। থামল দরজার ওদিকে।

বেজে উঠল ঘণ্টা!

মাথা ঘুরছে রাসকোল্‌নিকভের। একবার মনে হল, ঘণ্টার আওয়াজ শুনে বুড়িই বুঝি মেঝে ছেড়ে উঠে আসছে দরজা খুলে দেবার জন্যে...

'কী আশ্চর্য! ঘুমিয়ে পড়ল নাকি দু'জনে?'

আগন্তুকের গলা! ঢং ঢং করে আবারও ঘণ্টা বাজাচ্ছে!

আরও একজনের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। উঠে আসছে সিঁড়ি দিয়ে। উঠতে উঠতে বললো হেঁকে—'কক্? কেউ নেই ঘরে?'

'না থাকলে ঘর বন্ধ কেন ভেতর থেকে? ঘুমোচ্ছে নিশ্চয়। এদিকে আসতে বলল ঠিক আটটায়।' আবার বাজল ঘণ্টা, ধাক্কা পড়ল দরজায়—সেই সঙ্গে হাঁক-ডাক।

দরজার এদিকে রাসকোল্‌নিকভ শক্ত করে ধরে রয়েছে পাল্লা।

দ্বিতীয় লোকটার গলা শোনা গেল—'কক্। ব্যাপার সুবিধের মনে হচ্ছে না।'

'সাড়া দিচ্ছে না কেন?' বললো প্রথমজন।

'খুন হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।'

'খুন!'

'খুনী হয়তো ঘরেই আছে। বেরোতে পারবে না। তুমি দাঁড়াও—আমি ডেকে আনি দারোয়ানকে।'

একজনের পায়ের আওয়াজ নেমে গেল নিচে।

কক্ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘণ্টা বাজাচ্ছে আর পাল্লা দিয়ে টানাটানি ঠ্যালাঠেলি করছে। চাবির ফুটো দিয়ে ভেতরে দেখবার চেষ্টাও করছে।

কুড়োল বাগিয়ে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রাসকোল্‌নিকভ।

লড়বার জন্যে সে তৈরি। কিন্তু উৎকণ্ঠা যে আর সইতে পারছে না।

হঠাৎ প্রচণ্ড ইচ্ছে হল, চেঁচিয়ে বলে ওঠে—'এই যে আমি!'

শেষ হয়ে যাক সমস্ত উৎকণ্ঠার।

একী! কক্ নামের লোকটা যে হন্তদন্ত হয়ে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে!

ভয় পেয়েছে! খুনী যদি একা পেয়ে তাকেই মেরে দেয়?

চট করে বেরিয়ে এল রাসকোল্‌নিকভ।

তরতর করে নেমে এল চারতলায়...তিনতলায়...

আচমকা আবার হৈ-হল্লা ভেসে এল নিচ থেকে!

দড়াম করে খুলে গেল একটা দরজা—দৌড়ে নেমে গেল একজনের পায়ের আওয়াজ।

'ধর! ধর! পালাল যে! মিট্‌কা! এই মিট্‌কা!'

ভীষণ চমকে উঠেছিল রাসকোল্‌নিকভ। কিন্তু চেঁচামেচিটা যে তাকে নিয়ে নয়, তা বুঝতে পেরে যেই আবার নামতে যাচ্ছে... তিন-চারটে গলার আওয়াজ শোনা গেল একই সঙ্গে। কক্ আর তার বন্ধুর কণ্ঠস্বর চেনা যাচ্ছে...

ওরা দলবেঁধে উঠছে!

মরিয়া হয়ে গেল রাসকোল্‌নিকভ। দাঁড়িয়ে থাকলে তো দেখে ফেলবে—চিনে ফেলবে।

নেমেই যাওয়া যাক!

লোকগুলোও উঠছে। আর একটা তলা বাকি—মোড় ঘুরলেই—

সামনের ঘরের একটা দরজা খোলা রয়েছে। একটু আগেই তো রঙের মিস্ত্রীরা কাজ করছিল এখানে! এইমাত্র হুল্লোড় করে নেমে গেল ওরাই।

এই তো সুযোগ! ফাঁকা ঘরে ঢুকে পড়ল রাসকোল্‌নিকভ।

আর ঠিক সেই সময়ে দলবল নিয়ে তারস্বরে কথা বলতে বলতে কক্ উঠে গেল সেই দরজার সামনে দিয়ে।

পায়ের শব্দ ওপরে মিলিয়ে যেতেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল রাসকোল্‌নিকভ।

সিঁড়ি বেয়ে নিচতলায়। সেখান থেকে বাড়ির বাইরে।

কেউ ওকে দেখতেও পেল না।

পাঁচ

রাসকোল্‌নিকভ অনেকক্ষণ অবসন্ন শরীরটাকে যেন টেনে হিঁচড়ে নিয়ে পাগলের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছিল। দরদর করে ঘেমেছে আর টলেছে। রাস্তার লোক ভেবেছে নেশাখোর যাচ্ছে।

অবশেষে ফিরল বাড়িতে। ফটক পেরিয়ে পা দিল সিঁড়িতে। কিছুটা উঠেই খেয়াল হল কুড়োলের কথা।

ওটা তো ফেরৎ দিতে হবে দারোয়ানের ঘরে! কিন্তু দিতে গেলেই একরাশ প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। জবাব দেবার মত মন এখন নেই। কি বলতে কি বলে ফেলবে। শেষে ধরা পড়ে যাবে।

নিজের ঘরে নিয়ে যাবে নাকি ? সেখানেও যদি কেউ দেখে এবং জিজ্ঞেস করে ? কি জবাব দেবে ?

তার চাইতে... নেমে এসে সটান দারোয়ানের ঘরের সামনেই গেল রাসকোল্‌নিকভ। কেউ নেই ঘরে। বেঞ্চির তলায় কুড়োল রেখেই বেরিয়ে এল সে। ভাগ্য ভাল। কেউ নেই আশেপাশে। কেউ তাকে দেখেনি।

সিঁড়ি বেয়ে ওঠবার সময়েও কারো সঙ্গে দেখা হয়নি। দেখা হলে অবশ্যই চমকে উঠত তার চেহারা দেখে!

ঘরে ঢুকেই টুপি, কোট, প্যান্ট, বুট পরেই সে আছড়ে পড়ল বিছানায়—তারপর আর কিছু মনে নেই।

ঘুম ? না, না। ঘুমের চাইতেও বড় জিনিস—বিস্মৃতি। ও যেন ভুলে গেল সবকিছুই—এমন কি নিজের নামটাও।

এইভাবেই ঘোরের মধ্যে কাটল সারাটা সময়। মাঝে মাঝে চেতনা ফিরে আসছে—আবার আচ্ছন্নের মত নেতিয়ে পড়ছে।

রাত যখন প্রায় দু'টো, রাস্তায় নেশাখোরদের চেঁচামেচিতে ঘোর কাটল আর একবার।

তড়াক করে উঠে বসল বিছানায়—'কী সর্বনাশ! অনেক রাত হল যে!'

আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল সবকিছু!

কাঁপছে রাসকোল্‌নিকভ...ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে...শীতের জন্যে, নাকি জ্বর এল ? পাগল হয়ে যাচ্ছে না তো ?

দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি লাগছে—এত কাঁপুনি! তা সত্ত্বেও ঘরের বাইরে গেল। কান খাড়া করে শুনল কেউ কোথাও জেগে আছে কিনা।

সারা বাড়ি ঘুমোচ্ছে। নিস্তব্ধ চারদিক।

ঘরে ফিরে এসে বিড়বিড় করতে থাকে আপন মনে—'আশ্চর্য! টুপিটা পর্যন্ত না খুলে ঘুমিয়ে পড়লাম! টুপি তো গড়াচ্ছে মেঝেতে। যে দেখবে, সে-ই বলবে, নিশ্চয় নেশা করেছি—'

এই পর্যন্ত বকেই ছিটকে গেল জানলার সামনে। যথেষ্ট আলো আসছে জানলা দিয়ে। চোখ বড় বড় করে দেখতে লাগল নিজের জামাকাপড়...রক্তের দাগ নেই তো? দেখেছে মাত্র একবার...হয়তো চোখ এড়িয়ে গেছে।

খুলে ফেলল সমস্ত জামাকাপড়...তন্নতন্ন করে দেখল কোথাও এক ফোঁটাও রক্ত আছে কিনা...দেখল নিজের সারা গা!

কোথাও কিছু নেই। শুধু-শুধু ভয় পাচ্ছে। তবে হ্যাঁ, কালোমত ক'টা ফোঁটা দেখা যাচ্ছে বটে শতচ্ছিন্ন প্যান্টের পায়ের কাছে।

রক্ত! রক্তের ফোঁটা! শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে।

শিউরে উঠে রাসকোল্‌নিকভ। তক্ষুণি ছুরি দিয়ে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে কেটে ফেলে সেই জায়গার কাপড়।

ব্যস! এবার নিশ্চিন্ত। আর ঠিক তক্ষুণি মনে পড়ে যায় টাকার থলির কথাটা—আর সিন্দুকের গয়নাগুলো?

বুড়ির গলা থেকে থলি আর সিন্দুক থেকে গয়না নিয়ে ঠেসেঠুসে রেখেছিল কোট আর প্যান্টের পকেটে। রক্তমাখা হাতে। হাতের রক্ত ধুয়েছে—ওগুলোয় তো রক্ত লেগে রয়েছে!

এতক্ষণ মনেও পড়েনি। পাগল হয়ে গেল কি রাসকোলনিকভ! রক্তমাখা জিনিসগুলো পকেটে নিয়ে ঘুরেছে! তাই নিয়ে অঘোরে ঘুমিয়েও ছিল এতক্ষণ!

কী সর্বনাশ! কী সর্বনাশ! পাগলের মতই পকেট হাতড়াতে লাগলো রাস-কোল্‌নিকভ।

এই তো! পকেটেই রয়েছে লুটের জিনিস! সেই সঙ্গে রয়েছে রক্তমাখা রুমালটাও।

ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন। ঠিক সময়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছেন। মাথাটাও ঠিকঠাক কাজ করছে। অর্থাৎ, ঈশ্বর তার সহায়, তাই ধরা পড়েনি—নিশ্চয় পড়বেও না। মাথাটাও খারাপ হয়নি; তাই এত চুলচেরা ভাবতে পারছে।

কোথায় লুকোনো যায় জিনিসগুলো? এই তো পুঁচকে ঘর। বাক্স আলমারি কিচ্ছু নেই।

এদিক-ওদিক চাইতেই চোখে পড়ল দেয়ালের গায়ে ছেঁড়া হলুদ কাগজগুলো দিকে। ছিঁড়ে গিয়ে ঝুলছে। নিচে নিশ্চয় গর্ত আছে? ইঁদুরের গর্ত। ঘরে ইঁদুর আছে অনেক।

লাফ দিয়ে গিয়ে কাগজের তলায় হাত গলিয়ে গর্ত খুঁজতে থাকে রাসকোল্‌নিকভ। পেয়েও যায় মনের মত একটা ফোকর। ওপরে ঝুলছে ছেঁড়া কাগজ। বাইরে থেকে দেখা যায় না গর্তের মুখ।

তাড়াতাড়ি টাকার থলি আর গয়নাগুলো ঢুকিয়ে রাখে সেই গর্তের মধ্যে। সরে এসে ঘাড় বাঁকিয়ে দেখতে থাকে নিজের কীর্তি!

চমৎকার! নিজেই নিজের বুদ্ধির তারিফ করে রাসকোল্‌নিকভ। আর অমনি একটা কাঁটা খচখচ করে ওঠে মনের মধ্যে।

টাকার থলিতে কিন্তু রক্ত জবজব করছিল। সেই রক্ত নিশ্চয় প্যান্টের পকেটেও লেগে রয়েছে—এতক্ষণ দেখাই হয়নি!

ধড়ফড় করে প্যান্টের পকেট বাইরে টেনে নিয়ে দেখে ও। সত্যিই দাগ রয়েছে! রক্ত! রক্ত!

দেখে কি খুশিই না হয় রাসকোল্‌নিকভ! মগজ বটে তার! কী বুদ্ধি! খুন করেছে সবার চোখের আড়ালে—পালিয়েও এসেছে সবার চোখে ধুলো দিয়ে।

এখন কি সুন্দরভাবে একটার পর একটা প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করে যাচ্ছে!

অসাধারণ মানুষ সে! নইলে এত ঠাণ্ডা মাথায় এত বড় কাজ কি করতে পারত?

খুশি খুশি মনে ছুরি দিয়ে কচ্‌কচ্‌ করে কেটে ফেলল প্যান্টের পকেট। রক্তমাখা কাপড়টা এখুনি ফেলে আসতে হবে বাইরে। ঘরে রাখা বিপজ্জনক।

এখনও ভোরের আলো ওঠেনি। এই বেলা বেরিয়ে পড়া যাক।

উঠতে গিয়েও ওঠা হল না। রক্তমাখা প্যান্টের পকেটটা কারারগ্লেসের ঠাণ্ডা উনুনের মধ্যে রেখে ঢাকনা চাপা দিল। তারপর বিছানায় মাথা রেখে একটু গড়িয়ে নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল তক্ষুণি।

ঘুম! ঘুম! ঘুম! বেহুঁশ ঘুম!

ধড়মড় করে উঠে বসল দশটায় দরজার ওপর দুমদাম ধাক্কা শুনে। ব্যাপার কী? পুলিশ এসে গেল নাকি?

আসুক! এর আগে ও যেচে নিজেকে ধরিয়ে দিতে গেছিল—এবারও না হয় দেবে। এত উকণ্ঠা আর সয় না!

বিছানায় বসেই হাত বাড়িয়ে দরজার ছিটকিনি খুলে দিল রাসকোল্‌নিকভ।

হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল প্রথমে ন্যাসটাসিয়া—পেছনেই দারোয়ান!

রক্ত পানি হয়ে যায় রাসকোল্‌নিকভের!

দারোয়ান তার ঘরে কেন? কখনও তো আসে না! তবে কি কুড়োল নেওয়ার ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে?

দারোয়ান চেয়ে আছে তার দিকে—মুখ গম্ভীর।

চেঁচাচ্ছে ন্যাসটাসিয়া—'কী কাণ্ড! দরজায় তো কক্ষণো ছিটকিনি দাও না—আজ কেন দিলে ? কি আছে তোমার ঘরে যে চুরি করতে চোর ঢুকবে ?'

'ঘুমটা ভাঙালে কেন ?'

'বেলা দশটা বাজল—ঘুম ভাঙাব না ? ক'দিন ধরেই দেখছি খালি ঘুমিয়েই যাচ্ছো! উঠে পড়ো—অফিসে যাও—চিঠি এসেছে।'

'অফিসে! চিঠি!'

'পুলিশ অফিস থেকে চিঠি এসেছে!'

দারোয়ান মুখখানা গম্ভীর করে চেয়েই ছিল—গরিব ভাড়াটেদের দিকে সে এইভাবেই তাকায়।

রাসকোল্‌নিকভের কিন্তু মনে হচ্ছিল—কুড়োলের ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে বলেই তাকিয়ে আছে অমনভাবে।

চিঠিখানা ছিল তারই হাতে। কটমট করে তাকিয়ে চিঠি দিয়ে বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে।

কাঁপা হাতে চিঠি খুলল রাসকোল্‌নিকভ।

পুলিশ তাকে থানায় যেতে বলেছে—আজকেই।

বিড়বিড় করে ওঠে রাসকোল্‌নিকভ—'এ আবার কি ব্যাপার! থানায় যাব কেন ?'

'ভাড়া দাওনি, ভুলে গেছো ?' ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে ন্যাসটাসিয়া—'বাড়িওলি নালিশ তো ঠুকবেই!'

'ভাড়া দিইনি বলে কি আজকেই ডাকতে হবে ?'

'চা খাবে ?'

'চা!' কিছু খেতে হবে ভাবতেই গা গুলিয়ে ওঠে রাসকোল্‌নিকভের—চোখের সামনে ভেসে ওঠে থইথই রক্ত।

ওর মুখের চেহারা দেখে এবার চমকে ওঠে ন্যাসটাসিয়া। ঝপ্ করে হাত দেয় কপালে।

চোখ কপালে তুলে বলে—'জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে যে! থাকগে আজকে—যেতে হবে না থানায়।'

'না, না আজকেই যাব। যত দেরি করব, যন্ত্রণা ততই বাড়বে।'

রেগে যায় ন্যাসটাসিয়া—'তবে যাও! বলছিলাম তোমার ভালর জন্যেই।' রেগেমেগে চলে যায় ন্যাসটাসিয়া।

চিঠিখানা আর একবার পড়ল রাসকোল্‌নিকভ। সাদামাটা চিঠি। এখুনি থানায় যেতে হবে—কেন, কি বৃত্তান্ত—সেসব কথা লেখা নেই।

ভাড়া বাকি ফেলেছে বলে ধমকাবে ? বাড়িওলি নালিশ ঠুকেছে বলে ঠিক আজকেই চিঠিখানা এল ?

নিশ্চয় নয়। কেন থানায় যেতে হবে তা জানে শুধু পুলিশ আর রাসকোল্‌নিকভ।

যাই হোক, আজই যাওয়া যাক। এই উৎকণ্ঠার অবসান ঘটুক।

রাতে জুতোমোজা খুলে রেখেছিল রাসকোল্‌নিকভ—দেখেছিল কোথাও রক্ত লেগে আছে কিনা। এখন সেই মোজা পরতে গিয়ে আবার আঁতকে উঠল ভীষণভাবে।

রক্ত লেগে রয়েছে মোজায়! অথচ তন্নতন্ন করে দেখেছিল রাতে। তখন তো চোখে পড়েনি! ঠিক তেমনি, জামাকাপড়েও নিশ্চয় এখনও রক্ত লেগে আছে—রাতে চোখে পড়েনি...

ভাবতে ভাবতেই ফের জামাকাপড় খুলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রক্তের দাগ খুঁজতে লাগল রাসকোল্‌নিকভ।

নিশ্চিন্ত হলো অনেকক্ষণ পরে। নেই। আর কোথাও নেই রক্ত। শুধু ওই মোজায়। অন্য মোজাও তো নেই!

বাধ্য হয়ে ওই মোজাই পরতে হলো। পুলিশ তো জেনেশুনেই তাকে ডেকেছে—রক্তের দাগ দেখল তো বয়েই গেল!

মোজাটা পরে হাসি পায় রাসকোল্‌নিকভের। রক্তের দাগ তো ময়লা মোজায় চাপা পড়ে গেছে বললেই চলে! রক্ত বলে শুধু ও জানে, তাই ধরতে পারছে—অন্যের কাছে ওটা ময়লা ছাড়া কিস্‌সু নয়!

বেরিয়ে পড়ল রাসকোল্‌নিকভ। ঘর খোলা রইল। ফায়ারপ্লেসের ঠাণ্ডা উনুনের মধ্যে রইল রক্তমাখা প্যান্টের পকেট। মেঝেতে প্যান্টের পা থেকে চেঁচে নেওয়া শুকনো রক্ত। দেওয়ালের কাগজের আড়ালে গর্তের মধ্যে গয়না আর রক্তমাখা টাকার থলে।

পুলিশ দপ্তর। মস্ত বাড়ি। সিঁড়িতে লোকজন উঠছে আর নামছে, বারান্দায় ভিড় করে রয়েছে। অফিসঘরগুলোতেও লোকে ভর্তি।

এককোণে দাঁড়িয়ে দরদর করে ঘামছে রাসকোল্‌নিকভ। পা কাঁপছে। জ্বরে মাথা ঘুরছে।

অফিসঘরে ঢুকবে? পেট থেকে যদি সব কথা বের করে নেয়?

মনে মনে ভাবছে—'মাথার তো ঠিক নেই—কি বলতে কি বলে বসব!'

শেষকালে মরিয়া হয়ে ঢুকে পড়ল ঘরে। কেরানীদের একজনকে দেখাল পুলিশের চিঠিটা। সে বললো উদাসীনভাবে—'ছাত্র নাকি?'

'জ্বি হ্যাঁ। আগে তাই ছিলাম।'

সবশেষের ঘরটা দেখিয়ে বললে কেরানী—'বড় সাহেবের কাছে যান।'

বড়সাহেবের ঘরে আরও ভিড়। তিনি চিঠিখানা দেখেই বললেন—'একটু বসুন।'

বলেই, বকর বকর করতে লাগলেন সামনের ভদ্রমহিলার সঙ্গে।

বসেই রইল রাসকোল্‌নিকভ। একটু একটু করে সহজ হয়ে এল। মনে মনে বললো—'যা ভেবেছিলাম, দেখছি তা নয়। সাবধানে কথা বলতে হবে—বেফাঁস বললেই মরব। ইস্! এত হাওয়া কম এখানে! মাথা ঘুরছে!'

আচমকা সত্যিই মাথার মধ্যে যেন কিরকম দাপাদাপি আরম্ভ হয়ে গেল। প্রচণ্ড ইচ্ছে হল তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে কেঁদেকেটে একাকার করে এখুনি—'খুনী! খুনী! আমি খুনী!' নিজেই গলাবাজি করে কথাটা জানাবে এইখানেই!

অতি কষ্টে নিজেকে সামলে রাখলো রাসকোল্‌নিকভ।

জোর করে অন্যমনস্ক হতে চাইল। চোখ পাকিয়ে চেয়ে রইল বড় সাহেবের দিকে। নেহাৎই ছেলেমানুষ! খুব জোর বাইশ বছর বয়স। কিন্তু মুখখানাকে এমন গম্ভীর করে রেখেছে যে দেখে মনে হচ্ছে না জানি কি কত বয়স! তার ওপর সাজের বাহারও আছে। টেরি কেটেছে কত কায়দা করে। আঙুলে আঙুলে আংটি ঝলমল করছে। ওয়েস্টকোটে সোনার চেন ঝিকমিক করছে। মুখে ফরাসী বুকনি ফুরফুর করে বেরিয়ে আসছে।

সেজেগুজে যে মেয়েটি সামনেই দাঁড়িয়েছিল, পাশের খালি চেয়ারে সে বসতে সাহস পাচ্ছিল না।

বড়সাহেব বললেন—'বসতে পারো, লুইজি আইভানোভ্‌না।'

মেয়েটি বসল। তার ঠিক তক্ষুণি ভীষণ চেঁচামেচি করতে করতে ওপরওলা এসে ধাঁই করে মাথার টুপিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো টেবিলে—ধপ্ করে বসে পড়ল আরামকেদারায়।

তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়লো মেয়েটি। তার আর বসা হল না।

রাসকোল্‌নিকভ চোখের পাতা না ফেলে চেয়ে রইল ওপরওলার দিকে। সহকারী সুপারিটেনডেন্ট বলেই মনে হচ্ছে। লালচে গোঁফ খাড়া হয়ে হরিণের শিং-এর মত উঠে রয়েছে মুখের দু-পাশে। নাক ছোট, মুখ ছোট, চোখ ছোট। ভীষণ দাম্ভিক।

রাসকোল্‌নিকভ যে একদৃষ্টে তাঁকে দেখছে, তিনিও সেটা দেখেছেন। রাসকোল্‌নিকভের নোংরা জামাকাপড় দেখেও তাকে তাচ্ছিল্য করতে পারেননি, কারণ তার চোখ-মুখ চালচলনের মধ্যে রয়েছে শিক্ষাদীক্ষার ছাপ।

কিন্তু সে যেই হোক, থানায় বসে থানায় ওপরওলার দিকে এইভাবে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থাকে এমন আস্পর্ধা খুব কম লোকেরই আছে।

তিনি তাই ধমকে উঠেছিলেন কড়া গলায়—'কে তুমি? কি চাও?'

থেমে থেমে জবাব দিল রাসকোল্‌নিকভ—'থানার চিঠি পেয়ে এসেছি।'

তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন বড়সাহেব—'টাকা আদায়ের জন্যে ডেকে পাঠানো হয়েছে। এই যে—' বলতে বলতে টেবিল থেকে একটা দলিল তুলে নিয়ে রাসকোল্‌নিকভের সামনে ফেলে দিয়ে বললেন—'পড়ুন।'

মনটা নিমেষে হাল্কা হয়ে গেল রাসকোল্‌নিকভের। খুনী হিসেবে তাহলে তাকে ডাকা হয়নি! নাকি মিথ্যে বলছেন বড়সাহেব ?

ওপরওলার মেজাজ কিন্তু সপ্তমে চড়ে রয়েছে। আরও কড়া ধমকের সুরে বলে উঠলেন—'নটায় আসতে বলা হয়েছে—এসেছেন বারোটায়—'

মাথায় রক্ত চড়ে গেল রাসকোল্‌নিকভের। পাল্লা দিয়ে চেঁচিয়ে জবাব দিল বেশ কড়া গলাতেই—'নোটিশ পেয়েছি মাত্র পনেরো মিনিট আগে। এসেছি এই যথেষ্ট—জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে আমার।"

'চেঁচাবেন না।'

'আপনি আগে চেঁচিয়েছেন। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। চেঁচিয়ে কথা বললে সইতে পারি না।'

মুখ লাল হয়ে গেল সহকারি সুপারিনটেনডেন্টের। চেয়ার থেকে ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন তারস্বরে—'এটা সরকারি অফিস। বেয়াদবি করবেন না।'

সমানে চেঁচিয়ে বলতে লাগল রাসকোল্‌নিকভ—'সরকারি অফিসে রয়েছেন আপনিও। চেঁচাচ্ছেন, আবার সিগারেটও খাচ্ছেন।'

ফিক্ করে হেসে ফেললেন বড় সাহেব। ওপরওলার এই অপমান তাঁর ভালই লেগেছে।

ঝেড়ে গলাবাজি করে রাসকোল্‌নিকভও বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করছে। কিন্তু তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন সহকারি সুপারিনটেনডেন্ট—'তাতে আপনার কী ? মুচলেকা দিতে এসেছেন—দিয়ে চলে যান। ভাড়ার টাকা বাকি পড়ে কেন ?'

কথা কানে তুলল না রাসকোল্‌নিকভ। বড়সাহেবের দেওয়া দলিলটা তখন সে পড়ছে। অনেকদিন আগে ঘরভাড়া আর খাওয়ার টাকা শোধ করতে পারেনি বলে বাড়িওলিকে সে লিখে জানিয়েছিল। এটা সেই কাগজ। বাড়িওলি পুলিশকে জানিয়েছে—রাসকোল্‌নিকভ বোধহয় এই টাকা না দিয়েই শহর ছেড়ে চম্পট দেওয়ার ফিকিরে আছে। পুলিশ যেন টাকাটা আদায় করে দেয়।

কাগজটা পড়ে বিরক্তি ঝড়ে রাসকোল্‌নিকভের। এই ব্যাপার!

খুশি মনে মুচলেকা লিখে দিল তক্ষুণি। টাকা না দিয়ে শহর ছেড়ে যাবে না—শুধু এই প্রতিশ্রুতি।

সহকারি সুপারিনটেনডেন্টের তর্জন গর্জন তখনও সমানে চলছে। এবারে তার চোখে পড়লো পরিপাটি মেয়েটির ওপর—'লুইজি, আবার তোমার বাড়িতে চেঁচামেচি হয়েছে ? এর আগে দশবার হয়েছে—বারণ করা সত্ত্বেও আবার ?'

'আমি কি করব ? নামকরা সেই লেখক আমারই টাকায় পেট পুরে খেয়ে আবার আমার কাছ থেকেই পাঁচ রুব্‌ল ধার করে নিয়ে গেলেন। তারপরও সেকী হম্বি তম্বি! না দিলে নাকি কাগজে কাগজে আমার কুৎসা রটাবেন!'

এত সাফাই শোনবার সময় কোথায় সহকারি সুপারিনটেনডেন্টের ? তেড়েমেড়ে লুইজি মেয়েটাকে বেশ কিছু বকাঝকা করে বিদেয় করলেন।

তারপর ঝাল ঝাড়তে লাগলেন রাসকোল্‌নিকভের ওপর—'লেখক! জাতটাই আলাদা! সেদিন এক লেখক হোটেলে খেয়ে পয়সা না দিয়ে ধমকেছে—দাম চাইলেই প্যারডি গান লিখব তোমার নামে! আর একজন লেখক সেদিন স্টিমারে চেপে যাচ্ছেতাই ঝগড়া করেছে একজন খানদানী ভদ্রলোকের সঙ্গে। লেখক, ছাত্র—সব একই দলের!'

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন সহকারি সুপারিনটেনডেন্ট। সারা ঘর গমগম করছে তাঁর লেকচারে। ঘরসুদ্ধ লোক হাঁ করে শুনছে তাঁর বক্তৃতা।

এমন সময়ে ঘরে ঢুকলেন জমকালো চেহারার এক পুরুষ। দেখতে সুন্দর। মুখে হাসি। নাকের নিচে মোটা গোঁফটা ভারি চমৎকার!

ইনি পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট—নিকোডিম ফোমিচ।

ঘুরে ঢুকেই ঠাট্টার সুরে বললেন সহকারি সুপারিনটেনডেন্টকে—'ইলিয়া পেত্রোভিচ—তোমার হাঁকডাক তো সিঁড়ি থেকে শোনা যাচ্ছে!'

'তা তো যাবেই।' বলেই আরামকেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ইলিয়া পেত্রোভিচ। গিয়ে বসলেন দূরের ছোট্ট একটা টেবিলে।

আরামকেদারায় বসলেন নিকোডিম ফোমিচ।

ছোট টেবিলে বসেও কথার ফুলঝুরি চালিয়ে গেলেন ইলিয়া পেত্রোভিচ—'বলছিলাম লেখক আর ছাত্রদের কীর্তিকলাপের কথা। এই যে এই ভদ্রলোক—ছাত্র—অথচ ঘরভাড়ার টাকা দেননি। দেবার ইচ্ছেও নেই। নালিশ আসছে আমাদের কাছে। আবার থানায় বসে ধমক দিচ্ছেন আমাকেই—সিগারেট খাচ্ছি কেন ? জামাকাপড়ের ছিরি তো দেখছেন—'

শান্ত গলায় বললেন নিকোডিম ফোমিচ—"শুধু-শুধু রেগে যাচ্ছ, ইলিয়া। গরিব হওয়া কি অপরাধ ? আপনার কি ব্যাপার বলুন তো ?'

প্রশ্নটা করলেন রাসকোল্‌নিকভকে।

বুঝিয়ে বলল রাসকোল্‌নিকভ। পকেট খালি তো টাকা দেবে কোত্থেকে ? মা টাকা পাঠাচ্ছেন—এলেই কড়ায় গন্ডায় পাওনা মিটিয়ে দেবো।

'বেশ তো,' বললেন নিকোডিম—'মুচলেকা লিখে দিয়ে যান ঠিক সেইভাবে।'

লেখা তো শুরুই করেছিল রাসকোল্‌নিকভ। তাড়াতাড়ি লিখতে পারছে না—এত হাত কাঁপছে!

বড় সাহেবও তা লক্ষ্য করেছেন।

বললেন—'শরীর খারাপ নাকি ?'

'মাথা ঘুরছে। আর কিছু লিখতে হবে ?'

'না। সই করে দিন।'

সই করে কাগজ কলম বড়সাহেবের হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে আবার দু-হাতে রগ চেপে ধরে টেবিলে দু-কনুই রেখে ঝুঁকে পড়ল রাসকোল্‌নিকভ।

মাথার ভীতরটা মনে হচ্ছে চৌচির হয়ে ফেটে যাবে!

আচমকা একটা চিন্তা মাথাচাড়া দিচ্ছে—এখুনি গিয়ে সব বলতে হবে নিকোডিমকে। ওঁকে ডেকে নিয়ে যাবে নিজের ঘরে—দেওয়ালের গর্ত থেকে বের করে দেবে গয়না আর টাকা।

ভয়ঙ্কর চিন্তাটা ওকে ঠেলে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ঝোঁকের মাথায় পা পর্যন্ত বাড়িয়েছে নিকোডিমের দিকে...

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা চিন্তা লাফঝাঁফ শুরু করে দিলো মাথার মধ্যে—'এত তাড়াহুড়ো কেন? আর একটু ভাবতে ক্ষতি কী?'

ঝোঁকটা তেড়ে উঠল তক্ষুণি—'আবার চিন্তা কী? খুলে বলে হাল্কা হয়ে যাও এখুনি।'

নিকোডিমের দিকে দু-পা এগিয়ে গেল রাসকোল্‌নিকভ। থমকে গেল নিকোডিমের কথাটা শুনে! এ কী বলছেন উনি ইলিয়াকে? বলছেন—'খুন করে কেউ দারোয়ান ডাকতে যায়? দু'জনেই বেকসুর খালাস পাবে।'

'ওটাই তো ওদের ধড়িবাজি—' বললো ইলিয়া।

'অতটা ধূর্ত ওরা নয়। তাছাড়া, বাড়িতে ঢোকবার আগে কক্‌ নিচের তলায় এক স্যাকরার দোকানে ছিল আধঘণ্টার মত। ওর বন্ধু পেচত্রিয়াকভ যখন এল, তখন তার সঙ্গে ছিল তিনজন বন্ধু। এত লোকজন নিয়ে কেউ খুন করতে আসে?'

'কিন্তু ওদের কথার মধ্যেই তো গোঁজামিল থেকে যাচ্ছে। দারোয়ানকে বলেছিল, বুড়ির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। দারোয়ান গিয়ে দেখল, দরজা হাঁ করে খোলা।'

'কি মুশকিল! খুনীই তো দরজা বন্ধ করে রেখেছিল। কক্‌ আর পেচত্রিয়াকভ দারোয়ানকে ডাকতে নেমে যেতেই খুনী দরজা খুলে নেমে গেছে। কক্‌ তো বলছেই—খুব জোর বেঁচে গেছে। না নেমে গেলে কুড়োলের কোপ ওর মাথাতেও পড়তো।...

ইলিয়া বললেন—'অথচ কেউ দেখতে পেল না খুনী কে?'

এই সময়ে বলে উঠলেন বড় সাহেব—'বাড়িটা যে সেকেলে। অলিগলি অনেক—'

নিকোডিম বললেন—'তাহলে দ্যাখো—খুনী ওরা নয়। দু'জনেই নির্দোষ।'

টেবিল থেকে টুপিটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল রাসকোল্‌নিকভ।

জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল দরজা পর্যন্ত পৌঁছনোর আগেই।

জ্ঞান ফিরে এল রাসকোল্‌নিকভের। আধশোয়া অবস্থায় রয়েছে একটা চেয়ারে। বাঁ দিকে একটা লোক ধরে রয়েছে ওকে। ডান দিকে আর একজন। হাতে এক গেলাস হলদে তরল পদার্থ।

সামনেই দাঁড়িয়ে নিকোডিস ফোমিচ। ধারালো চাহনি দিয়ে দেখছেন ওকে। দাঁড়িয়েছিলেন ইলিয়াও। এইমাত্র সরে গেলেন।

রাসকোল্‌নিকভ ধড়মড় করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই তীক্ষ্ণ গলায় শুধোলেন নিকোডিম—'আপনার কি শরীর খারাপ?'

বড় সাহেব বলে উঠলেন—'মুচলেকা লেখবার সময়ে হাত কাঁপছিল। সই করেছেন অনেক কষ্টে।'

টেবিল থেকে হেঁকে জিজ্ঞেস করলেন ইলিয়া—'অসুখ কদ্দিনের?'

'কাল থেকে', আস্তে করে বললে রাসকোল্‌নিকভ।

'বেরিয়েছিলেন কালকে?'

'হ্যাঁ।'

'জ্বর সত্ত্বেও?'

'হ্যাঁ।'

'কটার সময়ে?'

'সাতটা নাগাদ।'

'কোথায় গেছিলেন?'

'রাস্তায়।'

'ব্যস?'

রাসকোল্‌নিকভের চোখে চোখে চেয়ে প্রশ্ন করে যাচ্ছেন ইলিয়া। চোখ না নামিয়ে একইভাবে জবাব দিয়ে যাচ্ছে রাসকোল্‌নিকভ।

নিকোডিম বলে উঠলেন—'ভদ্রলোক খাড়া থাকতে পারছেন না—এখন কি জেরা করার সময়?'

অদ্ভুত গলায় বললেন ইলিয়া—'এটাই তো সময়।'

কি বলতে গিয়েও থেমে গেলেন নিকোডিম। হঠাৎ চোখোচোখি হয়েছে বড় সাহেবের সঙ্গে। ভদ্রলোক শক্ত চোখে চেয়ে আছেন নিকোডিমের দিকে।

হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে গেল গোটা ঘরটা। বড় অস্বভাবিক নিস্তব্ধতা।

বলে উঠলেন ইলিয়া—'আসতে পারেন এখন।'

বেরিয়ে গেল রাসকোল্‌নিকোভ। যেতে যেতে শুনল, ঘর আবার মুখর হয়ে উঠেছে তিনজনের কথায়। সবার ওপরে শোনা যাচ্ছে নিকোডিমের প্রতিবাদের গলা।

রাস্তায় নেমেই দ্রুত বাড়ির দিকে পা চালায় রাসকোল্‌নিকভ। মাথা এখন পরিষ্কার। কিন্তু মনে আতঙ্ক চেপে বসেছে আগের মতই।

'সন্দেহ করেছে পুলিশ। এবার হবে খানাতল্লাশী!'

ছয়

রাসকোল্‌নিকভের মাথার মধ্যে দুশ্চিন্তার তুফান ছুটছে। পুলিশ আসবার আগেই গয়না আর টাকার থলি সরাতে হবে নিজের ঘরের ভেতর থেকে।

কে জানে, এতক্ষণে হয়তো পৌঁছেই গেছে পুলিশ। ওদের তো গাড়ি আছে, ঘোড়া আছে। রাসকোল্‌নিকভের আগেই পৌঁছেছে, দেওয়ালের গর্ত থেকে রক্তমাখা জিনিসগুলো হয়ত টেনে নামাচ্ছে!

তাহলে তো এখুনি শহর ছেড়ে চলে যেতে হয় রাসকোলনিকভকে। কিন্তু পালিয়ে গিয়েও তো মনটা স্বস্তি পাবে না। ঘরের ব্যাপারটা নিজে না জানা পর্যন্ত যাবে কোথায়?

তাই ঘরেই ফিরে এল রাসকোল্‌নিকভ। গিয়ে দেখল, ঘরটা যেমন ছিলো ঠিক তেমনি আছে। পুলিশ তো আসেইনি—ন্যাসটাসিয়াও ঘরে ঢুকেছে বলে মনে হচ্ছে না।

দৌড়ে গেল দেয়ালের সামনে। হাত ঢুকিয়ে দিল গর্তের মধ্যে। এই তো রয়েছে গয়না আর টাকার থলি!

তাড়াতাড়ি টেনে বার করে কোট আর প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে নিল রাসকোল্‌নিকভ। প্যান্টের একটা পকেট তো কেটে বাদ দিয়েছে—অন্য পকেটটায় মালপত্র ঢোকাল অল্প করে—যাতে বেশি উঁচু না হয়ে থাকে।

বেরিয়ে এল ঘর থেকে মাথা উঁচু করে। মাথা এখন বেশ পরিষ্কার। পুলিশ আসতে পারে যে কোনো মুহূর্তে। তার আগেই লুকিয়ে ফেলতে হবে এই জিনিসগুলো।

খালের পানিতেই ফেলে দেবে সবকিছু। ল্যাঠা চুকে যাবে তাহলে।

কিন্তু খালের ধারে গিয়ে দেখে সে আর এক ঝামেলা। লোক গিজগিজ করছে। রাসকোল্‌নিকভের স্পষ্ট মনে হচ্ছে যেন সব্বাই ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। একবার খালের ধার পর্যন্ত নেমে গিয়ে মনে হল সব্বাই যেন আরও বেশি করে দেখছে ওকে।

যাওয়া যাক নদীর ধারে। শহর থেকে বেশ দূরে। সেখানে নিশ্চয় লোক যাবে না। কিন্তু নদী পর্যন্ত যেতেও হল না। রাস্তা দিয়ে হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে চোখে পড়ল একটা কানাগলি, বেশ নির্জন জায়গা। লোকজন একদম নেই।

খামোকা নদী পর্যন্ত যাবার দরকারটা কী ? এইখানেই তো লুকিয়ে রাখা যায় সমস্ত জিনিস। কাকপক্ষীও টের পাবে না।

গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল রাসকোল্‌নিকভ। একটু দূরেই একটা বড় পাথর। পাথরের পাশে একটা পচা ডোবা।

গলির দুপাশে উঁচু দেয়াল। সে দেয়ালে দরজা নেই, জানালা নেই। চারতলা গুদামবাড়ির দেয়াল এটা—পেছন দিক বলে দেয়ালে দরজা জানালা কিচ্ছু নেই।

বড় পাথরটা রয়েছে ভেতরের উঠোনে। তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। কেউ কোথাও নেই।

তারের বেড়া ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকল রাসকোল্‌নিকভ। মতলবটা ছিল ডোবার পানিতে ফেলে দেবে গয়না আর থলে। পাথরের ওপর দাঁড়িয়েছিল সেই উদ্দেশ্যেই।

কিন্তু আচমকা মনে হল, তার কি দরকার ? বিশাল এই পাথরের তলায় জিনিসগুলো লুকিয়ে রাখলেই তো হয়!

যেমনি ভাবা, তেমনি কাজ। পাথরটা মন দেড়েক ভারি, টেনে তুলে তলার মাটি সরিয়ে একটু গর্ত খুঁড়ে নিল হাত দিয়ে। তারপর পকেট থেকে গয়না আর টাকার থলি বের করে রাখল তার ভেতরে।

ভারি পাথর দিয়ে চাপা দিয়ে দিল গর্তটা। আশপাশের ঝুরো মাটি হাত দিয়ে টিপে টিপে সমান করে দিল। ব্যস! আর কোনো ভয় নেই। পুলিশ এসে করুক খানাতল্লাশী—ঘরে পাবে না কিচ্ছুই।

তবে এখনও একটা জিনিস রয়ে গেছে। রক্তমাখা কাটা পকেটটা। সেটা রয়েছে বালিশের তলায়।

আরও আছে পায়ের এই রক্তমাখা মোজা। এটাকেও বিদেয় করতে হবে। কিন্তু আর তো মোজা নেই তাঁর। পরবে কি রাসকোল্‌নিকভ ?

এইসব আবোলতাবোল উল্টোপাল্টা চিন্তা নিয়ে সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াল রাসকোল্‌নিকভ।

বাড়ি ফিরল সন্ধ্যায়। নিদারুণ অবসাদে শরীর আর চলছে না। কোনোমতে জামাকাপড় খুলে ওভারকোটটা গায়ে দিল। মাথাটা বালিশে দিয়ে শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়ল অঘোরে।

কতক্ষণ এইভাবে ঘুমিয়েছিল, তা জানা নেই রাসকোল্‌নিকভের। তবে ঘুম ছুটে গেল একটা কানফাটা আর্তনাদে।

আঁতকে উঠে চোখ খুললো সে। কিন্তু গভীর অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পেলো না। ঘুটঘুটে অন্ধকারেও বিরামবিহীনভাবে সেই ভয়ানক আর্তনাদটা হয়েই চলেছে। কানের পর্দা যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে সেই শব্দে।

শুধু কি আর্তনাদ! আরও অদ্ভুত আওয়াজ মিলেমিশে রয়েছে বুকফাটা চেঁচানিটার সঙ্গে। কারা যেন গলা চিরে চেঁচাচ্ছে। হাউহাউ করে কাঁদছে। বিটকেল একটা ঘরঘর আওয়াজও শোনা যাচ্ছে—সেই সঙ্গে বেদম ঠ্যাঙানো হচ্ছে কাউকে। গালাগাল আর অভিশাপ দেওয়া হচ্ছে তারস্বরে!

কী ব্যাপার এসব ? এমন কাণ্ড, এমন অস্বাভাবিক আওয়াজ তো কখনও শোনেনি সে!

ধড়মড় করে উঠে বসল রাসকোল্‌নিকভ। চাপ চাপ অন্ধকারের মধ্যে মারপিট, চেঁচামেচি, কান্নাকাটি, অভিশাপ আরও বেড়ে গেল!

কাঠের মত বসে বসে শুনছে রাসকোল্‌নিকভ। শুনছে আর হতভম্ব হয়ে যাচ্ছে।

আচমকা মনে হল—ওই যে বিচ্ছিরি হাউমাউ কান্না—ওটা বাড়িওলির গলা থেকে বেরোচ্ছে। কাঁদছে আর কাকুতি-মিনতি করছে। ঠেঙানি খাচ্ছে আর তড়বড় করে এন্তার কথা বলে যাচ্ছে। এত তাড়াতাড়ি বলছে যে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না রাসকোল্‌নিকভ।

মারধর চলছে সিঁড়ির ওপর। বাড়িওলির একটা কথা শুধু বোঝা যাচ্ছে—মেরো না...মেরো না...মেরো না।...

কে এমনভাবে পিটাচ্ছে বাড়িওলিকে ? ভীষণ রেগেছে লোকটা। এক নাগাড়ে সে-ও চেঁচাচ্ছে—তারও কথা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। গলা তো নয়—যেন ব্যাঙের ডাক। বিকট চিৎকার!

এ গলা যেন এর আগেও কোথায় শুনেছে রাসকোল্‌নিকভ। মনে পড়ে যায় পরক্ষণেই। এ যেন ইলিয়া পেত্রোভিচ! ভীষণ দাম্ভিক সেই সহকারি সুপারিনটেনডেন্ট।

ইলিয়া বাড়ি বয়ে এসে মারছে বাড়িওলিকে! কী আশ্চর্য! কেন এই মার! ধাঁই ধাঁই করে লাথি মারছে। ঠকাস ঠকাস করে সিঁড়ির ধাপে মাথা ঠুকে দিচ্ছে! কেঁদে ককিয়ে হাট বসাচ্ছে বাড়িওলি!

লণ্ডভণ্ড কাণ্ড চলছে বাড়িময়! লোকজন ধুপদাপ ধুমদাম করে ছুটে আসছে পাঁচতলা চারতলা তেতলা থেকে। তারা সবাই চেঁচাচ্ছে দড়াম করে দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে—আবার দুমদাম করে পাল্লাগুলো খুলেও যাচ্ছে।

হাত বাড়িয়ে দরজার ছিটকিনিটা তুলে দিতে গেল রাসকোল্‌নিকভ। পারল না। একটা আঙুলও নড়াতে পারল না। শরীর তার বরফের মত ঠাণ্ডা—নিদারুণ আতঙ্কে!

পুলিশ এসে গেছে বাড়িতে। এবার আর তার নিস্তার নেই।

বিকট আওয়াজগুলো কিন্তু একটু একটু করে কমে আসছে। ইলিয়া পেত্রোভিচ এখনও বাজখাঁই গলায় চিৎকার করছে। বাড়িওলি এখনও মরাকান্না কাঁদছে। একগাদা লোক হঠাৎ দুড়দাড় করে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

চলে যাচ্ছে পুলিশ ? রাসকোল্‌নিকভকে না ধরেই ? তবে এসেছিল কেন ?

হঠাৎ দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল একটা আলো।

ঘরে ঢুকল ন্যাসটাসিয়া। হাতে তার প্লেট, চামচ, রুটি, তরকারি। বললো—'হোটেলের খাবার শেষ। একটু তরকারি ছিল এনেছি—খেয়ে নাও। সারাদিন তো টো-টো করে ঘুরেছে—জ্বরে কাঁপছও দেখছি।'

'ন্যাসটাসিয়া, বাড়িওলিকে মারছিল কেন ?'

'বাড়িওলিকে মারছিল ? কে ?' তীক্ষ্ণ চোখে তাকায় ন্যাসটাসিয়া।

'পুলিশের সহকারি সুপারিনটেনডেন্ট। সিঁড়ির ওপর ফেলে কি মার মারল এতক্ষণ! কেন ?'

ন্যাসটাসিয়া শুধু চেয়ে রইল। চোখ আরও তীক্ষ্ণ। মুখে কথা নেই। অস্বস্তি বোধ করে রাসকোল্‌নিকভ।

বলে ভয়ে ভয়ে—'কথা বলছ না কেন, ন্যাসটাসিয়া ?'

'রক্ত! রক্ত!' আপনমনে বললে ন্যাসটাসিয়া।

'রক্ত! কিসের রক্ত ?' বলতে বলতে রাসকোল্‌নিকভের মুখ থেকেও যেন রক্ত নেমে যায়—চোখ ফিরিয়ে নেয় দেয়ালের দিকে।

ন্যাসটাসিয়া কিন্তু তখনও একদৃষ্টে চেয়ে আছে ওর দিকে।

তারপর বললো শক্ত গলায়—'কেউ মারেনি বাড়িওলিকে।'

'নিজের কানে শুনলাম এতক্ষণ ধরে। বাড়িসুদ্ধ লোক দৌড়ে এল। কি মার! কি চিৎকার! পুলিশে ছেয়ে গেছিল গোটা বাড়ি।'

'কেউ আসেনি। তোমার মাথায় রক্ত উঠেছে। মাথায় রক্ত উঠলে অমন আজগুবি আওয়াজ শোনা যায়। যাকগে, কিছু খাবে ?'

'না, ন্যাসটাসিয়া। পানি দাও, পানি খাব।'

বেরিয়ে গিয়ে কুঁজোয় করে পানি এনে দিল ন্যাসটাসিয়া। খেতে গিয়ে গা-মুখ ভাসিয়ে ফেলল রাসকোল্‌নিকভ।

তারপর ওর আর কিছু মনে নেই।

মুখে পানি ঢালবার পর থেকেই জ্ঞান হারিয়েছিল রাসকোল্‌নিকভ। পুরো অজ্ঞান অবস্থা নয়। ঘোরের মধ্যে থেকেছে। কখনও প্রলাপ বকেছে, কখনও ঝিম মেরে পড়ে থেকেছে। কখনও মনে হয়েছে ঘরে লোক গিজগিজ করছে—তাকে কোথায় যেন নিয়ে যাওয়ার জন্যে কথা কাটাকাটি করছে। কখনও মনে হয়েছে—লোকগুলো পালিয়েছে তার ভয়ে—দরজা ফাঁক করে তাকে দেখছে...

ঘরে সে একলা রয়েছে।

লোকগুলো ঘরে ঢুকতে ভয় পাচ্ছে—দূরে দাঁড়িয়ে তাকে ভয় দেখাচ্ছে, টিটকিরি দিচ্ছে, মতলব আঁটছে তাকে জব্দ করার জন্যে।

ন্যাসটাসিয়াকে মাঝে মাঝে দেখেছে বিছানার পাশে।

আর, একটা লোককে।

লোকটাকে চেনে রাসকোল্‌নিকভ। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছে না তার নামটা।

মনে না করতে পারার জন্যে ভীষণ রাগ হচ্ছে নিজের ওপর। কেঁদেও ফেলছে হাউহাউ করে।

কখনও মনে হচ্ছে, প্রায় একমাস হল শুয়ে আছে এইভাবে।

আবার কখনও মনে হচ্ছে, এই তো মোটে একটা দিন অসুখে পড়েছে।

কিন্তু সবসময় একটা অস্বস্তি ফুর ফুরে খাচ্ছে বেচারীকে। অস্বস্তিটা একটা ভুলে যাওয়া ব্যাপার নিয়ে।

তার মন বারবার খুঁচিয়ে চলেছে—'ওহে রাসকোল্‌নিকভ, আসল ব্যাপারটা যে ভুলে যাচ্ছো!'

আসল ব্যাপারটা যে কী, তা কিছুতেই মনে করতে পারছে না রাসকোল্‌নিকভ।

প্রাণপণ চেষ্টা করেও যখন মনে করতে পারছে না—বিষম উদ্বেগে তখন ছটফট করছে। নয়তো ভীষণ রাগ হচ্ছে নিজের ওপর।

তারপরেই কেঁদে উঠছে গলা ছেড়ে!

আতঙ্ক চেপে বসছে মনের ওপর। ইচ্ছে হচ্ছে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে।

কিন্তু সেই লোকটা—যাকে চেনা মনে হলেও নামটা মনে করতে পারছে না রাসকোল্‌নিকভ—সে তাকে চেপে ধরে রাখছে বিছানায়।

গায়ের জোরে তার সঙ্গে পেরে উঠছে না রাসকোল্‌নিকভ। একসময়ে এলিয়ে পড়ছে বিছানায়। একটু একটু করে আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে।

অবশেষে একদিন ফিরে এল তার টনটনে জ্ঞান।

তখন সকাল দশটা। ঘরে রোদ এসে পড়েছে। ন্যাসটাসিয়া দাঁড়িয়ে বিছানার পাশে। পাশে একটা লোক—রাসকোল্‌নিকভ তাকে চেনে না। দরজার ফাঁক দিয়ে বাড়িওলি একদৃষ্টে তাকে দেখছিল। সরে গেল জ্ঞান ফিরে আসতেই।

বিষম খুশিতে বলে ওঠে ন্যাসটাসিয়া—'যাক, জ্ঞান ফিরল তাহলে।'

অচেনা লোকটাও বললো সঙ্গে সঙ্গে—'হ্যাঁ, জ্ঞান ফিরেছে।'

বাড়িওলির কথা ভাবতে গিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল রাসকোল্‌নিকভ।

এখন বললো অচেনা লোকটাকে—'তুমি কে?'

লোকটা জবাব দেবার আগেই দরজা খুলে গেল। কুঁজো হয়ে ঘরে ঢুকল রাজুমিখিন—রাসকোল্‌নিকভের সেই বন্ধু। এত ঢ্যাঙা যে, এই খুপরি ঘরে সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারছে না।

খুশি তার চোখেমুখে—'বাড়িওলির কাছে এখুনি শুনলাম, জ্ঞান ফিরে পেয়েছ।'

'জ্ঞান তো এল এখনি।' বললো ন্যাসটাসিয়া।

'হ্যাঁ, এখুনি।' আবার বললো সেই অচেনা লোকটি।

সবেগে তার দিকে ঘুরে দাঁড়ায় রাজুমিখিন—'তোমাকে তো চিনতে পারছি না!'

'শেলোপায়েভের অফিসের পিয়ন আমি,' বললো লোকটা—'দরকার আপনার এই বন্ধুর সঙ্গে।'

'কি দরকার?'

'ওঁর মা কিছু টাকা পাঠিয়েছেন আমাদের অফিসে ওঁকে দেবার জন্যে। এই যে খাতা—এতে সই করে দিলেই টাকা দিয়ে বিদেয় হই।'

'টাকা! খুবই দরকার এখন। ওঠো হে, রাসকোল্‌নিকভ, সইটা করো।'

'চাই না ওই টাকা!' মুখ ভার করে বলে ওঠে রাসকোল্‌নিকভ।

যেন আকাশ থেকে পড়ে রাজুমিখিন—'সেকী! টাকা নেবে না মানে? নিশ্চয় নেবে। দাও, তোমার হাত দাও—ধরে সই করিয়ে দিচ্ছি—'

'জোর করে সই করাতে হবে না। নিজেই করছি।'

খাতায় সই করিয়ে নিয়ে পঁয়ত্রিশ রুব্‌ল রাসকোল্‌নিকভের হাতে দিয়ে চলে গেল পিয়ন।

অমনি বকর বকর শুরু করে দিলো রাজুমিখিন—'উঃ! কি ঝামেলাতেই না ফেলেছিলে! চার দিন তোমাকে কিচ্ছু খাওয়াতে পারিনি। চামচে করে একটু একটু চা গিলিয়েছি শুধু। জোসিমভ ডাক্তারকে দুদিন এনেছিলাম। ও বলে গেল, ভারি অসুখ নয় এটা। না খেয়ে দেয়ে স্নায়ুর গোলমাল পাকিয়ে ফেলেছ। পেট ঠেসে খেলেই সব সেরে যাবে—ক্ষিধে পেয়েছে?'

'পেয়েছে।' বললে রাসকোল্‌নিকভ।

'ন্যাসটাসিয়া, সুপ আছে?'

'কালকেরটা আছে,' বললো ন্যাসটাসিয়া।

'আলু আর চালের সেই সুপ তো?'

'হ্যাঁ।'

'যাও, তাই নিয়ে এসো। চা-ও আনবে।'

অবাক হয়ে দেখে রাসকোল্‌নিকভ, রীতিমত দাবড়ানি দিয়ে ন্যাসটাসিয়াকে দিয়ে কাজ করিয়ে যাচ্ছে রাজুমিখিন! আশ্চর্য ব্যাপার মনে হচ্ছে তার! স্বপ্ন-টপ্ন দেখছে না তো রাসকোল্‌নিকভ?

চা-খাবার এসে গেল। টেবিলে সাদা চাদর পাতা হয়ে গেল। অনেকদিন এমনিভাবে খাওয়ার আয়োজন হয়নি এই ঘরে।

ফের হুকুম দেয় রাজুমিখিন—'বাড়িওলিকে দু-বোতল বীয়ার দিতে বলো।'

হুকুম তামিল করতে বেরিয়ে গেল ন্যাসটাসিয়া।

আরও হতভম্ব হয়ে যায় রাসকোল্‌নিকভ! অজ্ঞান হওয়ার আগে যার দিন কেটেছে ভিখিরির মত—বাড়িওলির লাথিঝাঁটাও খেতে হয়েছে। জ্ঞান ফিরে পেতেই তার সুদিন এসে গেল!

গরম সুপ চামচে করে নিয়ে রাসকোল্‌নিকভকে খাইয়ে দিতে দিতে বললো রাজুমিখিন—'ক'দিন ধরেই আমি এইভাবে খেয়ে যাচ্ছি রাজার হালে। বাড়িওলি আমাকে খাইয়ে খুশি হয়। তোমার নামে পুলিশে খবর দিয়েছিল বাজে লোকের উস্কানিতে—আর করবে না। টাকাপয়সাও আর চাইবে না। টাকা দেবে বলে যে কাগজটা তুমি লিখে দিয়েছিলে, সেটাও ফিরিয়ে দিয়েছে—এই নাও।'

বলে কাগজটা পকেট থেকে বের করে রাসকোল্‌নিকভকে দেখাল রাজুমিখিন—পরক্ষণেই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিল মেঝেতে।

কথা বলে চলল অবিরাম—'সেদিন তিনটে রুব্‌ল যখন ফেরৎ দিয়ে চলে এলে—তখনই তোমাকে আটকানো উচিত ছিল। আসলে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছিলাম। তক্ষুণি বেরিয়ে পড়লাম তোমার খোঁজে। ঠিকানা জানতাম না। তিন-তিনটে দিন অনেক খোঁজাখুজির পর এখানে যখন এলাম তখন তুমি জ্বরে বেহুঁশ।'

রাসকোল্‌নিকভ বলে ওঠে—'জ্বরের ঘোরে একটা লোককে কিছুতেই চিনতে পারছিলাম না—'

'সে লোকটা আমি,' মুচকি হেসে বললে রাজুমিখিন—'শুধু আমাকে কেন, জামেটভ এসেছিল। তাকে দেখেই তুমি এমন রেগে গেলে—'

'জামেটভ কে?'

'আরে! পুলিশ অফিসের সেই বড় সাহেব। সেখানেই তো তোমার সঙ্গে ওর আলাপ হয়। আমার কাছে তোমার নাম আর অসুখ শুনেই এসেছিল দেখা করতে।'

'পুলিশের বড় সাহেব!' খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল রাসকোল্‌নিকভের। পলকহীন চোখে চেয়ে আছে রাজুমিখিনের মুখের দিকে।

'আরে হ্যাঁ! আমার বন্ধু জামে সাহেব। তার সামনেই তো অজ্ঞান হয়ে গেছিলে। প্রলাপের ঘোরে ইলিয়া পেত্রোভিচ আর নিকোডিম ফোমিচকে নিয়ে কত সব আবোলতাবোল কথাই বলে গেলে।'

'কী? কী বলেছি?'

'যা-বাব্বা! অমন আঁতকে উঠছো কেন? এমন কিছু গোপন কথা বলোনি। সোনার গয়না, কানের দুল, গলার হার, দারোয়ান—যত্তসব আজেবাজে কথা! মাথামুণ্ডু বোঝাই যায় না। একবার তো মড়াকান্না জুড়ে দিলে তোমার মোজা নিয়ে। মোজা চাই এখুনি। অনেক খুঁজেপেতে শেষকালে তোমার এই বিছানার

তলা থেকেই মোজা টেনে বের করল জামেটভ। যার দশ আঙুলে দশটা আংটি—তাকে বাধ্য হয়ে নোংরা মোজাটা হাতে করে ধরে তুলে আনতে হল তোমার কান্নাকাটির ঠেলায়!'

'আর কিছু?' মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে রাসকোল্‌নিকভের।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আরও অনেক উদ্ভট কথা বলেছ। প্যান্টের কাটা পকেটের জন্যে একবার বায়না ধরলে। সে জিনিসটা অনেক খুঁজেও কোথাও পাওয়া গেল না। আচ্ছা, এখন যাই। দশটা রুব্‌ল নিয়ে যাচ্ছি—হিসেব পরে দেব।'

'দিতে হবে না।'

'আমি না ফেরা পর্যন্ত ন্যাসটাসিয়া তোমার দেখাশুনো করবে।' বলতে বলতে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল রাজুমিখিন। পেছন পেছন বেরিয়ে গেলো ন্যাস-টাসিয়াও।

তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে এল রাসকোল্‌নিকভ।

এবার সব মনে পড়েছে! পুলিশ যখন এসেছে, তখন নিশ্চয় সব জেনেই এসেছে। অসুখ দেখে না জানার ভান করেছে। এইবার নিশ্চয় আসবে ধরে নিয়ে যেতে।

পাগলের মত আশেপাশে চায় রাসকোল্‌নিকভ। দরজায় কান পেতে শোনে, সত্যিই কেউ পা টিপে টিপে আসছে কিনা।

ভীষণ ইচ্ছে হয় ছুটে পালিয়ে যাবার।

তারপরেই মনে হয়—'অসম্ভব! পুলিশ যদি সিঁড়ির তলায় ওৎ পেতে বসে থাকে?'

ছুটে যায় দেয়ালের কাছে। ফোকরে হাত ঢুকিয়ে দেখে—'গয়না আর পড়ে নেই তো?'

'না, নেই,' জবাব দেয় নিজেই—'প্যান্টের কাটা পকেটটা? রেখেছিলাম ফায়ারপ্লেসের ঠাণ্ডা উনুনের মধ্যে ঢাকনি চাপা দিয়ে। বের করে নিয়ে যায়নি তো?'

হন্তদন্ত হয়ে উনুনের ঢাকনি তোলে রাসকোল্‌নিকভ।

ঐ তো পড়ে রয়েছে রক্তমাখা কাটা পকেট!

হাঁফ ছেড়ে বাঁচে রাসকোল্‌নিকভ। আবার কিন্তু খচ্‌খচ্‌ করে ওঠে মনটা। রক্তমাখা মোজাটা হাতে নিয়েও জামেটভ ধরতে পারল না রক্ত লেগে রয়েছে ওতে? পুলিশের চোখে রক্ত ধরা পড়ে না? ময়লায় চাপা পড়ে গেছে বলে কি ভুল করে গেল? নাকি জেনেশুনে অভিনয় করে গেল?

বিকার গ্রস্থের মতো নিজেই নিজের সঙ্গে কথা যেনো বলতে থাকে রাসকোল্‌নিকভ—'জামেটভ কেন এসেছিল? রাজুমিখিন কেন ওকে নিয়ে এসেছিল? নিশ্চয় এর মধ্যে একটা রহস্য আছে। পালাতেই হবে দেখছি—পঁচিশ রুব্‌ল নিয়েই বেরিয়ে যাওয়া যাক। অন্য বাসায় উঠলে রাজুমিখিন আর আমাকে খুঁজে পাবে না। সবচেয়ে ভাল হয় দেশ ছেড়ে পালালে। আমেরিকায় চলে গেলেই

তো হয়! আমার জামা-কাপড় কই ? জুতো ? লুকিয়ে রেখেছে নিশ্চয়—যাতে পালাতে না পারি।'

উত্তেজিত হয়ে টেবিলের ওপর থেকে খামচি মেরে পঁচিশ রুব্‌ল তুলে নিতে গিয়ে থমকে গেল রাসকোল্‌নিকভ।

টেবিলে রয়েছে আধ বোতল বীয়ার।

তুলে নিয়েই ঢেলে দিল গলায়। আগুন জ্বলছিল যেন বুকে আর মাথায়।

বীয়ারের নরম নেশায় ঠাণ্ডা ছোঁয়াচ লাগে সেই আগুনে। ঠাণ্ডা স্রোত নেমে আসে শিরদাঁড়া বেয়ে। সেই সঙ্গে ঘুমঘুম ভাব।

বালিশে মাথা রেখে গায়ে লেপ জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ে রাসকোল্‌নিকভ। এ লেপ আগে ছিল না। এসেছে অসুখের সময়ে।

সাত

চোখ খুলল রাসকোল্‌নিকভ। দেখল, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রাজুমিখিন।

বললো সোল্লাসে, 'একটানা ছ-ঘণ্টা ঘুমোলে!'

'পুরো ছ-ঘণ্টা। তিন ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়েই আছি। যাক, এইভাবে ঘুমোলে চাঙা হয়ে যাবে শীগগিরই।'

'তোমার হাতে ওগুলো কী, রাজুমিখিন ?'

'তোমার নতুন জামাকাপড়।'

'আমার ?'

'যা পরে আছ, ওগুলো আর গায়ে দেওয়া যায় না। পরে দ্যাখো এগুলোর মাপ ঠিক আছে কিনা।'

প্যাকেট খুলে একগাদা পুরনো জামাকাপড় আর একজোড়া জুতো বের করল রাজুমিখিন।

ন্যাসটাসিয়া দাঁড়িয়েছিল ঘরের এককোণে। পুরনো জুতো দেখে বলে উঠল—'আন্দাজে জুতো কিনলে কি পায়ে লাগবে ?'

'আন্দাজে কিনতে যাব কেন ?' বলতে বলতে ওভারকোটের পকেট থেকে রাসকোল্‌নিকভের পুরনো জুতোজোড়া বের করল রাজুমিখিন—'এর মাপে কিনেছি।'

এখন বুঝল রাসকোল্‌নিকভ—কেন একটু আগে জুতো খুঁজে পায়নি। পাশ ফিরে শুলো সে দেওয়ালের দিকে মুখ করে।

অবাক গলায় বললো রাজুমিখিন—'ও কী! পছন্দ হল না জামাকাপড়-জুতো ?'

শুকনো গলায় বললো রাসকোল্‌নিকভ—'এসব কিনবার টাকা পেলে কোত্থেকে ?'

'সেকী! তোমার কাছ থেকেই তো দশ রুব্‌ল নিয়ে গেলাম।'

'আমি তো ভেবেছিলাম, চিকিৎসার খরচ মেটাতে নিয়ে গেছো।'

'চিকিৎসার আবার খরচ কী? জোসিমভ ডাক্তার তো আমার বন্ধু।'

'আর এই যে খাওয়া-দাওয়া?'

'এ তো রুগীর পথ্য। দিচ্ছে বাড়িওলি পাশেঙ্কা। আমার খাতিরেই সে এক পয়সাও নেবে না।'

'নেবে না?'

'না। সুতরাং কারো কাছেই তোমার দেনা নেই। চারদিন পেটে দানাপানি যায়নি তোমার—'

ঘরে ঢুকল জোসিমভ ডাক্তার—'শরীর কিরকম?'

'ভালই।' বললে রাসকোল্‌নিকভ।

'আমিও তাই দেখছি। ওষুধ বন্ধ থাক—খাওয়া চলুক। মাংস আর শশা বাদে। কালকের দিনটা দেখি, তারপর—'

গনগনে চোখে ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে রইল রাসকোল্‌নিকভ। চাহনিটার মানে হতে পারে এই রকম—ডাক্তার, ভীষণ ক্ষতি করে দিলে আমার!

ডাক্তারের মনে কিন্তু একটা সন্দেহ ঢুকে পড়ে রাসকোল্‌নিকভের ওই জ্বলন্ত চাহনি দেখে। কথা না বাড়িয়ে ঘর থেকে যেই বেরোতে যাবে, রাজুমিখিন চেপে ধরল তাকে—'জোসিমভ, আজ আমার বাড়িতে একটু খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে। তুমি তো আসবেই—রাসকোল্‌নিকভকে কি নিয়ে যেতে পারব?'

'খাওয়া-দাওয়া?' দুই চোখ বড় বড় করে তাকায় রাসকোল্‌নিকভ।

'বাড়ি পাল্টেছি—তাই। তোমার এই বাড়ির কাছেই ঘর পেয়েছি। তাই দু-চারজন বন্ধুবান্ধবকে ডেকে একটু ফুর্তি করব। সবাই তোমারা আমার মত ছাত্র। সেই সঙ্গে থাকছেন আমার মফস্বলের চাচা, আর পর্ফাইরি পেত্রোচি—'

'কে?' শেষ নামটা শুনে চমকে ওঠে রাসকোল্‌নিকভ।

'পর্ফাইরি পেত্রোভিচ। গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্তা।'

'তোমার আত্মীয়?'

'খুবই দূরে সম্পর্কের। পুলিশ অফিসে সেদিন ওঁর সঙ্গেই তোমার কথা কাটাকাটি হয়েছিল। তিনি লোক ভাল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি যাবে আমার সঙ্গে—মনে ঝাল পুষে রেখো না। জামেটভও আসছে।'

'ঘুষখোর জামেটভ?' ফস্‌ করে বলে ওঠে জোসিমভ।

'তাতে কি যায় আসে। ঘুষ খায় তো আমার কী? ঘুষ খাওয়াটা বরদাস্ত করি না ঠিকই—কিন্তু লোকটার অন্য দিকগুলো তো ভাল—'

'ভালো?' মিটমিট করে তাকায় ডাক্তার।

খুবই উত্তেজিত হয়ে যায় রাজুমিখিন। বললো হড় হড় করে রাসকোল্‌নিকভকে—'বুড়ি অ্যালিওনাকে মনে পড়ে ? এই তো সেদিন খুন হয়ে গেল। পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে নিরীহ এক রঙের মিস্ত্রীকে। আমি তাকে পুলিশের খপ্পর থেকে বের করবই—জামেটভের সঙ্গে সেই নিয়েই চলছে বুদ্ধির কসরত।'

'রঙের মিস্ত্রীকে খালাস করার জন্যে তোমার খাওয়া-দাওয়া শিকেয় উঠল কেন ?' ব্যঙ্গের সুরে বলে ডাক্তার।

'দ্যাখো জোসিমভ, অন্যায় অবিচার একদম সইতে পারি না বলেই মাথাটা গরম হয়ে যায় আমার।' বেশ রেগেছে রাজুমিখিন—'পুলিশের লোকগুলো পয়লা নম্বরের অবিচারক। বুড়ির খুনের জন্যে প্রথমে পাকড়াও করল নিরীহ দু'জনকে। কক্‌ আর পেচত্রিয়াকভকে তারা নাকি প্রথমে দরজা বন্ধ দেখেছিল—দারোয়ান দেখেছে, কথাটা ঠিক নয়—দরজা খোলাই রয়েছে। ব্যস, সেইটাই হয়ে গেল তাদের খুন করার মোক্ষম প্রমাণ! হা হা হা! আর এখন রঙমিস্ত্রীকে নিয়ে নাজেহাল করছে ঠিক ওইরকমই খেলো যুক্তি নিয়ে।'

'যুক্তিটা কী ?' ডাক্তার জানতে চাইল।

রঙ-মিস্ত্রী নিকোলে নাকি একজোড়া কানের দুল বেচবার চেষ্টা করেছিল।

'কানের দুল!'

'যে দুল ছিল বুড়ির সিন্দুকে।'

'যুক্তিটা খেলো মনে হচ্ছে না তো! বুড়িকে যে খুন করেছে, সে-ই তো কানের দুল নিয়েছে সিন্দুক থেকে।'

'কি মুশকিল!' ফের উত্তেজিত হয়ে যায় রাজুমিখিন—'কানের দুল তো ঘরে পড়ে থাকতেও পারে। রঙের মিস্ত্রী পড়ে থাকতে দেখেছে, তাই কুড়িয়ে নিয়েছে।'

'কোন ঘরে ?'

'যে ঘরে রঙের কাজ হচ্ছিল, নিচের একটা ফ্ল্যাটে। হঠাৎ দু'জনে ইয়ার্কি মেরে দৌড়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। দিত্রি নামে রঙের মিস্ত্রীটার পেছন পেছন দৌড়েছিল নিকোলে, দিত্রি-কে না পেয়ে ফিরে আসে যন্ত্রপাতি নিতে। একটা তুলি পাচ্ছিল না কিছুতেই। সেটাকেই খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ দেখতে পেল কানের দুলের বাক্সটা রয়েছে' 'দরজার পেছনে। 'দরজার পেছনে ?' আচমকা বেখাপ্পা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে রাসকোল্‌নিকভ।

থ হয়ে গেল রাজুমিখিন আর জোসিমভ ডাক্তার!

এতক্ষণ তো দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়েছিল রাসকোল্‌নিকভ। ওদের কথা শুনছিল বলে মনেই হচ্ছিল না। হঠাৎ এ কী মন্তব্য! এত উচ্ছ্বাসই বা কেন ?

রাসকোল্‌নিকভ নিজেও বুঝেছে, হঠাৎ করে চেঁচিয়ে উঠে নিজেকে সে সন্দেহভাজন করে তুলেছে দুই বন্ধুর চোখে।

তাই সামলে নেবার জন্যে বললো ঢোক গিলে—'দরজার পেছনে ছিল বলেই সবশেষে চোখে পড়েছে—নইলে আগেই দেখা যেত।'

'তা বটে! তা বটে!' বলল বটে রাজুমিখিন, কিন্তু বেশ বোঝা গেল মুখখানা তার উদ্বেগে কালো হয়ে উঠেছে। জোসিমভের মুখেও সেই একই উদ্বেগের কালো ছায়া।

রাসকোল্‌নিকভের কথায় যুক্তি থাকতে পারে—কিন্তু এতটা আবেগ আর উচ্ছ্বাস বড় বেখাপ্পা, বড় বেমানান।

ঠিক এই সময়ে ঘরে এলেন এক ভদ্রলোক। ফুলবাবুর মত সাজগোজ। মাঝবয়সী—চুল পাকতে শুরু করেছে। দেখেই বোঝা যায়, বেশ বড়লোক।

ঘরের তিন বন্ধু অবাক হয়ে চেয়ে রইল আগন্তুকের দিকে। এ আবার কে? বলা নেই কওয়া নেই, হুট করে ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে?

আগন্তুক শুধু ঘরেই ঢোকেননি—তাচ্ছিল্যের চোখে ঘরের দীনহীন অবস্থা দেখছেন। ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে, এতটা শ্রীহীন অবস্থা দেখতে হবে, তা তিনি আশা করেননি।

তিন বন্ধুর কাউকেই যে চেনেন না ভদ্রলোক, তা বোঝা গেল তাঁর প্রশ্নটা শুনে। প্রথমে তিনি ভীষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন বিছানায় শুয়ে থাকা-রাসকোল্‌নিকভের দিকে। তারপর তাকালেন রাজুমিখিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ির দিকে। তারপর তাকালেন জোসিমভের দিকে।

প্রশ্নটা করলেন তাকেই—কারণ তিনজনের মধ্যে শুধু তার জামাকাপড়ই ভদ্রচিত।

বললেন—'রোডিয়ন রোম্যানোভিচ রাসকোল্‌নিকভ কে বলুন তো?'

জবাবটা দিল রাজুমিখিন—'সোফায় শুয়ে আছেন। কি দরকার আপনার?'

কথাটা যেন বিশ্বাস হল না ভদ্রলোকের। জামাকাপড়ের যা ছিরি রাসকোল্‌নিকভের, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বলে মনেই হয় না।

তাই দুই চোখে সংশয় নিয়ে তাকালেন জোসিমভের দিকে।

হাই তুলে বললো জোসিমভ—'রাসকোল্‌নিকভ আপনার সামনেই—সোফায়,' বলে পকেট থেকে সোনার ঘড়ি বের করে সময়টা দেখে নিল চট করে।

ভয় পেয়েছে রাসকোল্‌নিকভ। বেশ মরিয়াও হয়ে গেছে সে। তড়াক করে উঠে বসল বিছানায়।

ভাঙা গলায় বললো—'হ্যাঁ, আমিই রাসকোল্‌নিকভ!'

ভাবখানা যেন—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিই রাসকোল্‌নিকভ! কি করবেন আমার?

ভদ্রলোক প্রথমে খুঁটিয়ে দেখলেন রাসকোল্‌নিকভের পা থেকে মাথা পর্যন্ত।

তারপর বললেন ধীরে গম্ভীর গলায়—'আমার নাম পিওত্‌র পেত্রোভিচ লুজিন। নামটা শুনেছেন নিশ্চয়?'

নিমেষে ভয় কেটে গেল রাসকোল্‌নিকভের। যাক, পুলিশের লোক নয়—এ সেই মহাকিপটে পয়সার চামার লোকটা—যে তার বোনকে বিয়ে করে কৃতার্থ করতে চায়।

জবাব দিতেও প্রবৃত্তি হল না রাসকোল্‌নিকভের।

লুজিন এতখানি উদাসীনতা আশা করেননি। আলতু ফালতু লোক নন তিনি। অথচ রাসকোল্‌নিকভ তো তাঁকে পাত্তাই দিচ্ছে না!

বলে উঠলেন ভারিক্কী গলায়—'কী আশ্চর্য! আমার কথা কি আপনাকে বলা হয়নি?'

একটি কথাও না বলে ফের শুয়ে পড়ল রাসকোল্‌নিকভ। লাল-লাল চোখে চেয়ে রইল লুজিনের দিকে। এই সেই শয়তান, যে কিনা তার বোনকে হুকুম করে এসেছে—গাঁটের কড়ি খরচ করে পিটার্সবার্গে এসে সে যেন তাকে বিয়ে করে!

হাওয়া থমথমে হয়ে উঠছে দেখে রাজুমিখিন একটা চেয়ার এগিয়ে দিল লুজিনের দিকে। একটু ভদ্রতা তো করা দরকার।

যেন খুবই কষ্ট হচ্ছে বসতে এমন একখানা চেয়ারে—এইভাবেই মুখখানা বেঁকিয়ে বসলেন লুজিন। তারপর যেন দয়া করতে যাচ্ছেন রাসকোল্‌নিকভকে, এমনি কণ্ঠস্বরে বললেন—'আমাদের এই প্রথম পরিচয় খুব শীগগিরই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়ে দাঁড়াবে—'

ব্যস, বাকি কথাগুলো আর বলাই হল না। বাঘের মতো গর্জে উঠল রাসকোল্‌নিকভ—'তা তো বটেই! তা তো বটেই! সব কাজই যে খুব শীগগিরই করতে চান আপনি!'

'না-মানে?' থতমত খেয়ে গেছেন লুজিন।

'দুনিয়া যেই বিয়ে করতে রাজি হল আপনাকে অমনি তাকে বলে বসলেন—'ভিখারিনী বলেই তাকে বিয়ে করবেন ঠিক করেছেন।'

'মিথ্যে কথা! আপনার মা আপনাকে বানিয়ে বানিয়ে লিখেছেন।'

'খবরদার!' ছিটকে উঠে বসল রাসকোল্‌নিকভ। চকচক করে জ্বলছে দুই চোখ—'মা-র সম্বন্ধে আর একটা বাজে কথা বললেই ছুঁড়ে ফেলে দেব সিঁড়ির ওপর থেকে!'

ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন লুজিন। জোরে ঠোঁট কামড়ে ধরে সামলে নিলেন নিজেকে। ঘনঘন নিশ্বাস নিতে নিতে বললেন অবরুদ্ধ গলায়—'ভাবতেও পারিনি এতটা দুর্ব্যবহার করবেন! শরীর খারাপ থাকলে অবশ্য মাথায় রক্ত উঠে যায় একটুতেই—'

'রক্ত! রক্ত ওঠেনি মাথায়! শরীর আমার খারাপ নয়!'

'তাহলে তো ব্যাপারটা আরও ঘোরালো হয়ে গেল!'

'জাহান্নামে যান আপনি!'

সাঁ করে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন কিপটে লুজিন।

ধমকে ওঠে রাজুমিখিন—'কাজটা ভাল হল না, রাসকোল্‌নিকভ।'

রাসকোল্‌নিকভের দু-চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে এল এবার—'বেরোও! তোমরাও বেরোও! একলা থাকতে দাও! কারো ধার ধারি না আমি!'

রাজুমিখিনের কানে কানে বললে জোসিমভ—'চলে এসো!'

'না।' বেঁকে বসেছে রাজুমিখিন। অসুস্থ বন্ধুকে এ অবস্থায় ফেলে যাওয়া যায়?

জোসিমভ ওকে ঠেলে নিয়ে এল বাইরে।

গজগজ করে ওঠে রাজুমিখিন বাইরে এসেই—'বিয়েটা বোধহয় আর হবে না।'

'তাতে রাসকোল্‌নিকভের বয়ে গেল।' বললে জোসিমভ—'শুধু ওই খুনের ব্যাপার ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে ইদানীং ওর আগ্রহ নেই।'

ভাবনায় পড়ে রাজুমিখিন—'সেদিন ও নাকি থানায় জ্ঞান হারিয়েছিল এই খুনের কথা কানে যেতেই।'

'তাই নাকি? সন্ধ্যের সময়ে শুনব পুরো ব্যাপারটা। ওর রোগটা অদ্ভুত—রুগী হিসেবেও ও অদ্ভুত।'

ঘরের মধ্যে কিন্তু একা থাকতে পারল না রাসকোল্‌নিকভ। ভয়ানক অস্থির লাগছে নিজেকে। রাজুমিখিনের কিনে আনা জামা-কাপড়-জুতো পরেই ছিটকে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

পাগলের মত এ-রাস্তায় সে-রাস্তায় কিছুক্ষণ ঘুরেই হঠাৎ মনে হল কিছু খাওয়া দরকার। পঁচিশ রুব্‌ল তো পকেটে আছেই—আছে আরও কয়েকটা তামার কোপেক।

একটা হোটেলে ঢুকল। খানসামা এসে দাঁড়াতেই তাকে কয়েক কোপেক বকশিস দিয়ে বললো—'গত পাঁচ দিনের খবরের কাগজ এনে দাও। আর কিছু খাবার আর চা।'

সবগুলো জিনিসই এল একসঙ্গে। মজা করে চায়ে চুমুক দিতে দিতে কাগজগুলোতে তন্নতন্ন করে রাসকোল্‌নিকভ খুঁজতে লাগল একটাই খবর।

খুনের খবর! যদি কোথাও কিছু ছাপা হয়ে থাকে!

ঠিক এই সময়ে একটা লোক এসে ওরই টেবিলে বসল।

কাগজ পড়তে পড়তে আড়চোখে তাকে দেখেই ভূত দেখার মত চমকে উঠল রাসকোল্‌নিকভ।

লোকটা জামেটভ। পুলিশ অফিসের বড় সাহেব!

চোখোচোখি হয়ে যেতেই অবাক গলায় বললো জামেটভ—'আরে! কালকেই তো দেখতে গিয়েছিলাম তোমাকে রাজুমিখিনের সঙ্গে। জ্বরে হুঁশ হারিয়ে যেভাবে পড়ে ছিলে—'

কাগজ নামিয়ে রাখল রাসকোল্‌নিকভ। জামেটভের চোখে চোখ রেখে বললো—'পাশের ঘরটায় কি করছিলে? ওখান থেকেই তো বেরিয়ে এলে আমাকে দেখে?'

'এক বন্ধুর সঙ্গে বসে গলা ভিজাচ্ছিলাম।'

'নাকি ঘুষ নিচ্ছিলে?'

'ঘুষ!'

'ওই হল গিয়ে!' অট্টহেসে বলে রাসকোল্‌নিকভ—'ঠাট্টা করছিলাম। ঘুষ নেয়া তো খারাপ নয়—তুমি নিচ্ছ, আর আমি ঠাট্টা করছি। যেমন নিকোলে করছিল দিত্রির সঙ্গে। ঠাট্টা করতে করতেই নিকোলে ছুটে বেরিয়ে গেল।'

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল জামেটভ।

আবার হা-হা করে হেসে ওঠে রাসকোল্‌নিকভ—'বুঝলে না? বুড়ির খুনের ব্যাপারটা বলছি হে!'

'তুমি জানলে কিভাবে?'

'তোমার চাইতেও বেশি জানি বলে। এখনও প্রলাপ বকে চলেছ! রাস্তায় বেরোনো ঠিক হয়নি তোমার।'

'তাই নাকি? তাই নাকি? প্রলাপ বকছি মনে হচ্ছে?'

'তা হচ্ছে বইকি! মন দিয়ে এত কাগজ পড়ছ কেন? কাগজে তো শুধু আগুন লাগার খবর। চারদিকে আগুন লেগেই চলেছে।'

অদ্ভুতভাবে চোখ নাচিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে ওঠে রাসকোল্‌নিকভ—'আগুন নয়, আগুন নয়—পড়ছি অন্য খবর! চাঞ্চল্যকর খবর! জানতে ইচ্ছে হচ্ছে বুঝি?'

'একটুও না! এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম। তবে তোমার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, বিকার এখনও যায়নি।'

'বিকার! বিকার কেন থাকবে? হাবভাব একটু খাপছাড়া হতে পারে—'

'খুবই খাপছাড়া।'

'কেন খাপছাড়া, তা যদি জানতে। জানো এই কাগজগুলো কেন পড়ছি?'

'কেন বলো তো?'

'বুড়িটার খুনের খবর খুঁজছি।' ষড়যন্ত্রকারীর মত ফিসফিস করে বলে ওঠে রাসকোল্‌নিকভ। একদৃষ্টে এখন ও চেয়ে রয়েছে জামেটভের চোখে চোখে।

হতভম্ব হয়ে যায় জামেটভ—'তা খোঁজো না।'

কথাটা যেন শুনতেই পেল না রাসকোল্‌নিকভ। ফিসফিস করে বলে গেল একই কথা—'বুড়িটা! সেই বুড়িটা! যার কথা শুনতে শুনতে ধাঁ করে অজ্ঞান হয়ে গেলাম থানায়।—বুঝেছ কি বলছি?'

জামেটভ এবার ভয় পেয়েছে। রাসকোল্‌নিকভের কথা, তার চাহনি মোটেই স্বাভাবিক নয়।

তাই আমতা আমতা করে বলে—'বুঝলাম না।'

ঠিক এই সময়ে রাসকোল্‌নিকভের মনে পড়ে যায় খুনের দিনটার কথা। দরজা বন্ধ। মেঝেতে বুড়ি মরে পড়ে আছে। হাতে কুড়োল নিয়ে দরজার এদিকে দাঁড়িয়ে রাসকোল্‌নিকভ। ওদিকে কক্‌ আর পেচত্রিয়াকভ। হঠাৎ বড় ইচ্ছে হয়েছিল গলা ছেড়ে হেসে উঠবার। ইচ্ছে হয়েছিল চিৎসার করে বলে—'এই যে আমি! বুড়িটা তো খুন হয়ে গেছে—সাড়া দেবে কি করে? আমি সাড়া দিচ্ছি...আমি...আমি...খুনী আমি...হা হা হা!'

ভাবতে ভাবতেই হা-হা করে হেসে ওঠে রাসকোল্‌নিকভ। দমকে দমকে হাসি বেরিয়ে আসে বুকের মধ্যে থেকে। কিছুতেই হাসি আটকাতে পারে না।

হেসে যায় উন্মাদের মত।

আঁতকে উঠে চেয়ার সরিয়ে বসে জামেটভ—'পাগল হলে নাকি?'

'পাগল? হয়তো। অথবা হয়তো খুনী! খুনই যদি করে থাকি, প্রমাণ করতে পারবে? খুন করলে তো বড়লোকি চালেই থাকতাম—এরকম গরিবি হালে থাকব কেন? হা হা হা! সন্দেহ করতে পারবে না।'

হাঁ করে চেয়েই আছে জামেটভ।

ক্রুর হাসি হাসে রাসকোল্‌নিকভ—'নজরে রেখেছ আমাকে, তাই না? দেখছ পকেট গরম আছে কিনা?'

এবার কিন্তু হেসে ফেলে জামেটভ—'তোমার মত শিক্ষিত মানুষ খুন করে পয়সা ওড়াতে হোটেলে ঢুকবে—এ কী ভাবা যায়? কি যে বলছ!'

'তবে কি ভাবা যায়?' আবার ব্যঙ্গ করে ওঠে রাসকোল্‌নিকভ—'আমার মত শিক্ষিত লোক খুন করবার পর কি কি করতে পারে বলে তোমার মনে হয়?'

ঢোক গেলে জামেটভ—'খুনীদের মনের খবর আমি জানব কি করে? তবে হ্যাঁ, করতে পারে অনেক কিছুই।'

'ঘোড়ার ডিম পারে!'

থতমত খেয়ে যায় জামেটভ। একটু একটু করে উগ্র হয়ে উঠছে রাসকোল্‌নিকভ। চিবিয়ে চিবিয়ে বলে যাচ্ছে—'আমি যদি খুনী হতাম, কি করতাম জানো? বুড়ির টাকা-পয়সা, গয়নাগাটি পকেটে নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম। যেতাম একটা নির্জন জায়গায়—যেখানে তারের বেড়া টপকালেই দেখা যাবে একটা প্রকাণ্ড পাথর। বহু বছর পড়ে আছে একইভাবে—পড়েও থাকবে সেইভাবে আরও অনেক বছর। গয়না আর টাকা লুকিয়ে রাখতাম সেই পাথরের তলায়। তোমরা পুলিশরা আমার পেছন পেছন ঘুরে মরে নাজেহাল হতে। তারপর হাল ছেড়ে

দিলে জিনিসগুলো বের করে আনতাম পাথরের তলা থেকে—থাকতাম রাজার হালে।'

অবাক হয়ে বলে জামেটভ—'কি যে বলো! পুলিশ তোমার পেছনে লেগে থাকবে কেন? তোমাকে সন্দেহই বা করতে যাবে কেন?'

'করেছে! করেছে! একশবার করেছে!' নিমেষে মাথার রক্ত চড়ে যায় রাসকোল্‌নিকভের—'নইলে কেন আমাকে জেরা করেছিল ইলিয়া পেত্রোভিচ নামে ওই বাজে লোকটা? তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে হাঁকডাক করে খানসামাকে ডেকে বিল চেয়ে আনে রাসকোল্‌নিকভ। বিলের টাকা মিটিয়ে দিয়েই পকেটের পঁচিশটা রুব্‌ল জামেটভকে দেখিয়ে দেখিয়ে ভীষণ চিৎকার করে বলে—'এতগুলো টাকা পকেটে এল কোত্থেকে, সেই খোঁজটা করো আগে। তাহলেই দেখবে খুনের সমাধান হয়ে যাবে। দু'দিন আগে তো পকেটে কানাকড়িও ছিল না—তাই না?'

বলতে বলতে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে এল রাসকোল্‌নিকভ। টলছে দস্তুর-মত। জামেটভকে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে দু-কথা শোনাতে পেরে মনটাও খুব খুশি। সেই সঙ্গে ভীষণ অবসাদে শরীর যেন ভেঙে পড়ছে।

গুম হয়ে বসে রইল জামেটভ। কিছুক্ষণ পরে বলে উঠল নিজের মনে—'ইলিয়া পেত্রোভিচের মত বোকা দুনিয়ায় আর নেই!'

হোটেল থেকে বেরিয়েই কিন্তু রাজুমিখিনের মুখোমুখি হয়েছে রাসকোল্‌নিকভ। ওকে দেখেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছে রাজুমিখিন—'আক্কেলের বলিহারি যাই! কাল পর্যন্ত অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে—আজকে ফিটফাট হয়ে হোটেলে খেতে এলে! খুঁজতে খুঁজতে প্রাণ যায় আমার! পাগল হলে নাকি?'

প্রচণ্ড রেগে গেলেও বাইরে খুব শান্ত রইল রাসকোল্‌নিকভ। বললো ধরা গলায়—'রাজুমিখিন, আমাকে একলা থাকতে দাও। তোমাকে আর অভিভাবক হয়ে থাকতে হবে না। দেখলেই তো, জোসিমভ আমাকে একলা রেখে চলে গেল। ডাক্তার বলেই বুঝেছে, যে মানুষ একলা থাকতে চায়, তাকে শাসন করতে গেলে, সে আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে।'

কথাটা শুনে ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায় রাজুমিখিন। জুৎসই জবাবটা মুখে আনবার আগেই দেখলো, দ্রুত পা চালিয়ে সরে পড়ছে রাসকোল্‌নিকভ।

পেছন থেকে বললো চিৎকার করে—'দাওয়াতের কথাটা মনে রেখো। পশিন্‌কভের বাড়ি, তেতলা, ৪৭ নম্বর ফ্ল্যাট। অবশ্যই আসবে।'

'না, আসব না।' যেতে যেতেই বলে উঠল রাসকোল্‌নিকভ।

'আসবে! আসতেই হবে!' চেঁচিয়ে বলে গেল রাজুমিখিন, কিন্তু বোধহয় শুনতে পেল না রাসকোল্‌নিকভ। হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে সে তখন অনেক দূরে চলে গেছে।

ভাবনায় পড়ে রাজুমিখিন। এভাবে ওকে ছেড়ে দেয়াটা ঠিক হল না। জোসিমভ এমন কথাও বলেছে—রাজকোল্‌নিকভের হয়তো মাথা খারাপ হয়েছে।

মাথা খারাপই যদি হবে তো অমন গুছিয়ে ধীরস্থিরভাবে কথাগুলো কিভাবে বলে গেল রাসকোল্‌নিকভ ?

'তাতে কী ?' নিজের মনেই বলে রাজুমিখিন—'অনেক বদ্ধ পাগলই কথা বলে দিব্যি বুদ্ধিমানের মত!'

ভাবতে ভাবতে হোটেলে ঢুকল রাজুমিখিন। এইভাবেই দেখা হওয়ার কথা জামেটভের সঙ্গে। দু'জনে মিলে যাবে একটা দাওয়াতে।

আপন মনে হেঁটেই যাচ্ছে রাসকোল্‌নিকভ। আচমকা হৈ-হৈ চেঁচামেচি শুনে চোখ তুলে দেখল, খালের পানিতে ঝাঁপ দিয়েছে একজন স্ত্রীলোক। একজন পুলিশ পানিতে নেমে গিয়ে আধডোবা শরীরটাকে টেনে নিয়ে তুলেছে রাস্তায়। ভিড়ের মধ্যে থেকে মড়াকান্না জুড়েছে আর একটি মেয়ে—এ যে অফ্রোসিনিয়া! ক্ষিধের জ্বালায় মরতে যাচ্ছিল!

মনটা খিঁচড়ে যায় রাসকোল্‌নিকভের! মরতেই যদি প্রাণ চায়, তাহলে খালের নোংরা পানিতে হাবুডুবু খাওয়ার কি দরকার ? কুড়োলের এক কোপেই তো মাথা দু'-ফাঁক হয়ে যায়! গলগল করে কি সুন্দর তাজা রক্ত বেরিয়ে আসে!

দূর! দূর! বড় উল্টোপাল্টা কাণ্ড ঘটছে এই দুনিয়াটায়! গলদ রয়েছে সমাজের সমস্ত ব্যবস্থায়!

হাঁটতে হাঁটতে চলে এল খালের পাশ থেকে অনেক দূরে। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল একটা বাড়ির সামনে।

এটা সেই বাড়ি—মাত্র পাঁচ দিন আগে যে-বাড়ির পাঁচতলায় কুড়োল চালিয়ে সমাজটাকে সুন্দর করার চেষ্টা করেছিল সে নিজে।

আপনমনে হাঁটতে হাঁটতে অজান্তে চলেই এসেছে যখন, দেখে যাওয়া যাক রক্তাক্ত ফ্ল্যাটের চেহারাখানা। প্রচণ্ড ঝোঁক চেপে বসেছে মাথায়—কিছুতেই সামলানো যাচ্ছে না নিজেকে।

এক-পা এক-পা করে এগিয়ে যায় সিঁড়ির দিকে। ধাপে ধাপে উঠতে থাকে সিঁড়ি বেয়ে।

তখন সন্ধ্যে হয়েছে। এতক্ষণ মিস্ত্রীরা কাজ করছিল সেই ফ্ল্যাটে—এবার তারা বাড়ি যাবে।

এমন সময়ে রাসকোল্‌নিকভ ঢুকল সেখানে।

অবাক হল মিস্ত্রীরা। প্রথমে ভেবেছিল পুলিশের লোক এসেছে।

কিন্তু পুলিশের লোক এরকম অদ্ভুতভাবে চারদিক দেখছে কেন ? বিড়বিড় করে বকছে কেন ? সত্যিই কি পুলিশ ? না, অন্য কেউ ?

সত্যিই বড় অদ্ভুত কাণ্ড করে যাচ্ছে রাসকোল্‌নিকভ। ঘরে ঢুকেই ভীষণ বিরক্তিতে মুখ-চোখ কুঁচকে ফেলেছে।

ঘরটা তার চেনা। কিন্তু মেরামতির কাজ করে মিস্ত্রীরা অচেনা করে তুলেছে ঘরটাকে। দেওয়ালে ঝুলত পুরনো হলদে কাগজ—সেসব খুলে ফেলে লাগানো হয়েছে নতুন কাগজ।

অন্যায়! অন্যায়! ঘোর অন্যায়! খিঁচড়ে যাওয়া মেজাজ নিয়ে ঢুকল ভেতরের ঘরে।

একটু খুশি হয় মনটা। কেন না, এ ঘরে এখনও হাত দেয়নি মিস্ত্রীরা। শুধু আগেকার আসবাপত্রগুলো আর দেখা যাচ্ছে না। দেরাজ নেই, সিন্দুক নেই...

তবে...ঘরের কোণে কে যেন বসে ?

বুড়িটা! নিশ্চয় সে! হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে-ই বটে। সন্ধ্যের আঁধার ঘরের কোণে কোণে জমে গেলেও বুড়িকে দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট।

পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বুড়ির দুই চোখ। চেয়ে আছে রাসকোল্‌নিকভের দিকে। চোখ মিটমিট করছে। চোখের এই ভাষা খুব স্পষ্ট!

বুড়ি যেন বলতে চাইছে—'ভালই করেছ। বন্ধকী কারবার থেকে রেহাই দিয়ে আমার ভাবনাচিন্তা যেমন শেষ করে দিলে ঠিক তেমনি এই সমাজটার কত মঙ্গল করলে বলো তো ? তবে হ্যাঁ, টাকা আর গয়না লুকিয়ে রাখলে কেন ? তোমার মত ভালো লোকের হাত দিয়ে ওগুলো খরচ হয়ে গেলে সমাজের চেহারা ফিরে যাবে!'

হঠাৎ কর্কশ গলায় ধমকে ওঠে একজন মিস্ত্রী—'এখানে কি চাই ?'

বলে কি মিস্ত্রীটা! বুড়ি অ্যালিওনার বন্ধুকে এইভাবে কেউ কথা বলে ?

রেগেমেগেই জবাব দেয় রাসকোল্‌নিকভ—'ভাড়া নেব এই ফ্ল্যাটটা।'

'ভাড়া নেবে তো দারোয়ানকে সঙ্গে নিয়ে এসো।'

কথাটা শুনতেই পেল না রাসকোল্‌নিকভ। সে তখন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে টুং-টাং করে ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে।

বেশ মিষ্টি আওয়াজ! ঠিক আগের মত। ঘণ্টার আওয়াজ নিশ্চয় এতক্ষণে শুনতে পেয়েছে বুড়ি।

রাসকোল্‌নিকভের মনে হল—দরজার ফাঁক দিয়ে মিটমিট করে দেখছে বুড়ি।

পকেটে হাত দেয় ও বন্ধকী জিনিসটা বের করার জন্যে।

সত্যি সত্যিই এবার ঝটাৎ করে খুলে গেল দরজার পাল্লা। বেগে বেরিয়ে এল একজন ষণ্ডামার্কা বেঁটে মিস্ত্রী। ধমকে উঠল কড়া গলায়—'ঘণ্টা বাজাচ্ছ কেন? কে তুমি?'

গম্ভীরভাবে বললে রাসকোল্‌নিকভ—'থানায় গিয়ে জিজ্ঞেস করো কে আমি। পেয়ে যাবে জবাবটা।'

থানা? থানার লোক নাকি? ঘাবড়ে যায় বেঁটে মিস্ত্রী।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে ফস করে প্রশ্ন করে রাসকোল্‌নিকভ—'রক্ত কোথায় গেল? সব ধুয়ে ফেললে?'

রক্ত! মিস্ত্রীদের চোখে এবার সন্দেহ ঘনিয়ে এসেছে। তাকাচ্ছে এ ওর দিকে। দেখে হুঁশ হয় রাসকোল্‌নিকভের। উজবুকের মত এত কথা বলা তার ঠিক হয়নি।

এখানে আর থাকাও উচিত নয়।

পেছন ফিরেই তরতর করে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

মিস্ত্রীরাও নেমে এল পেছন পেছন।

ফটক পেরিয়ে বেরিয়ে গেল রাসকোল্‌নিকভ।

মিস্ত্রীরা কিন্তু গেল দারোয়ানের কাছে।

বেঁটে মিস্ত্রীটা বললো—'থানায় নিয়ে যাও ওকে এক্ষুণি!'

ধমকে ওঠে দারোয়ান—'পুলিশের কাজ পুলিশে করুক। আমার বয়ে গেছে থানায় যেতে—ভাগো তোমরা।' মুখ চুন করে সরে পড়ে মিস্ত্রীরা।

রাসকোল্‌নিকভ ততক্ষণে অনেক দূরে। হঠাৎ চেঁচামেচি শুনে থমকে দাঁড়িয়েছে। অনেক লোক জমে গেছে রাস্তায়।

ঘোড়ার গাড়ি চাপা দিয়েছে একটা লোককে! উঁকি মেরে দেখেই চমকে ওঠে রাসকোল্‌নিকভ। রক্তমাখা ওই মানুষটাকে সে চেনে!

মার্মেলাডভ্! মাতাল মার্মেলাডভ্। একেই একদিন বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসেছিল। নিজের আংটি বন্ধক দেওয়া টাকা পয়সা থেকে পঞ্চাশ কোপেক রেখে এসেছিল বাচ্চাগুলোর খাবার কেনার জন্যে।

কেউ কিন্তু চিনতে পারছে না মার্মেলাডভ্‌কে। তাই সবাই বলছে—'দাও, দাও, হাসপাতালেই পাঠিয়ে দাও।'

মুখ বাড়িয়ে বলে ওঠে রাসকোল্‌নিকভ—'না, না, না। ওর বাড়ি কাছেই, আমি চিনি। চলো আমার সঙ্গে।'

সবাই মিলে যখন মার্মেলাডভ্‌কে বয়ে নিয়ে এল ওর বাড়ির সামনে, তখন কিন্তু ঘরের কোণে উলঙ্গ হয়ে বসে আছে বাচ্চা তিনটে। রোজ রাতে এইভাবে জামাকাপড় খুলে দেয় ওরা। ওদের মা কাশতে কাশতে মুখ দিয়ে রক্ত বের করতে করতে সেগুলো কেচে দেয়। শুকিয়ে গেলে ওরা পরে—আবার খুলে দেয় রাতে।

ঠিক এই সময়ে ওদের বাবার রক্তাক্ত দেহটা এসে পৌঁছলো বাড়ির সামনে! ধরাধরি করে নিয়ে আসা হল ঘরের মধ্যে।

'বিছানাতে শুইয়ে দাও,' বলে উঠল রাসকোল্‌নিকভ।

ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল না কিন্তু ক্যাটেরিনা—মার্মেলাডভের বউ। অভাব আর দুঃখ তাকে পাথর করে দিয়েছে। কাঁদতেও ভুলে গেছে।

ডাক্তার এল। ধর্মযাজক এল। দু'জনেই বলে দিলো—'কোনো আশা নেই।'

মার্মেলাডভ্‌-এর তখন জ্ঞান ফিরেছে। বলছে অস্ফুট গলায়—'সোনিয়া কোথায়?'

সোনিয়ার কোলে নিজের হাতখানি রেখে মারা গেল মার্মেলাডভ্‌।

ফাঁকা হয়ে গেল ঘর।

পকেট থেকে পঁচিশটা রুব্‌ল বের করে ক্যাটেরিনার হাতে তুলে দিল রাসকোল্‌নিকভ।

বললো—'আপনার স্বামীর শেষ কাজ করবেন এই টাকা দিয়ে।' বলেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

দুই চোখে গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে সোনিয়া চেয়ে রইল তার দিকে। চেয়ে রইল আরও একজন। তার দুই চোখে ঠিকরে পড়ছে। নাম তার লুজিন। যাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়েছে রাসকোল্‌নিকভ। এই বাড়িতেই সে উঠেছে—আড়াল থেকে সে দেখল সব কিছু।

রাস্তায় বেরিয়েই রাসকোল্‌নিকভ কিন্তু মুখোমুখি হল পুলিশের বড় কর্তার সঙ্গে। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই খোঁজ নিতে এসেছেন নিকোডিম ফোমিচ।

চমকে উঠলেন তিনি রাসকোল্‌নিকভকে দেখে—'কি ব্যাপার! এখানে আপনি?'

হেসে বললো রাসকোল্‌নিকভ—'এই মাত্র যে লোকটা মারা গেলো, দয়া করে তার বউটাকে আর জেরা করতে যাবেন না—বেচারার ক্ষয়রোগ আছে। কাশলেই রক্তবমি করে।'

'...কিন্তু আপনার সারা গায়ে যে রক্ত!' বলে উঠলেন নিকোডিম। মার্মেলাডভ্‌-এর মাথার রক্ত তো লেগে রয়েছে রাসকোল্‌নিকভের গায়ে।

ভ্রূক্ষেপ না করে রহস্যময় হাসি হেসে রাসকোল্‌নিকভ শুধু বললো—'ঠিক বলেছেন। রক্ত আমার সারা গায়ে!'

আট

রাজুমিখিনকে খুব জোর গলায় বলেছিল রাসকোল্‌নিকভ—দাওয়াত রাখতে যাবে না ? কিন্তু তারপর অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। ওর সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলা দরকার। তাই দাওয়াত রাখতেই চলল রাসকোল্‌নিকভ।

পথে পড়ে খালের ওপর সেই সেতু। একটু আগে এখানে থেকে ঝাঁপ দিয়ে মরতে গিয়েছিল এফ্রোসিনিয়া, ক্ষিধের জ্বালায়।

বুড়ি অ্যালিওনা-কে খুন করেছে রাসকোল্‌নিকভ ঝোঁকের মাথায়। ভালই করেছে। তাতে পাঁচজনের উপকার হবে।

বুড়ি মরেছে—যাক না বেহেস্তে। রাসকোল্‌নিকভ কিন্তু থাকবে এই দুনিয়ায়—বেঁচে থাকবে মানুষের মত।

এসব কথা মাথার মধ্যে নিয়ে দাওয়াত রাখতে গেল রাসকোল্‌নিকভ। কিন্তু ভাল লাগল না খানাপিনা আর হাসিহল্লা। বেরিয়ে এল বাইরে। বাড়ি ফিরে যাওয়া যাক।

সঙ্গে রাজুমিখিন এল। তার এক কথা—'তোমাকে একলা থাকতে দেব না।'

নাছোড়বান্দা বন্ধুকে সঙ্গে নিয়েই বাড়ির দিকে চলল রাসকোল্‌নিকভ। যেতে যেতে উল্টোপাল্টা অনেক কথাই বলে গেল অনর্গল। শুনে সত্যিই ভয় হয় রাজুমিখিনের।

জোসিমভ ডাক্তার ঠিক এই আশঙ্কাই করেছে। খুব সম্ভব মাথা খারাপ হয়েছে রাসকোল্‌নিকভের। বকর বকর করতে করতে বাড়ির সামনে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল রাসকোল্‌নিকভ। মুখ তার বিবর্ণ।

চোখ বড় বড় করে চেয়ে আছে পাঁচতলায় নিজের চিলেকোঠার খুপরি ঘরটার দিকে।

আলো জ্বলছে সে ঘরে!

পুলিশ এসেছে নিশ্চয়। নইলে এমন অসময়ে আলো জ্বালিয়ে কে বসে থাকবে টঙের ওই ঘরে ?

ফ্যাকাশে মুখে বললো রাজুমিখিনকে—'বিদায়!'

'বিদায়! কেন ?' রাজুমিখিন ঘাবড়ে গেছে বন্ধুর ভাবভঙ্গী দেখে।

আঙুল তুলে পাঁচতলার ঘরের আলো দেখিয়ে ম্লান হাসল রাসকোল্‌নিকভ—'ও ঘরে পা দেবার পর বিদায় নেবার সুযোগ আর পাব না। তাই এখনই বিদায় নিয়ে রাখলাম।'

দু'জনে উঠে গেল পাঁচতলায়। ঘরের দরজা বন্ধ। ভেতরে কারা যেন কথা বলছে।

এক ধাক্কায় দরজার পাল্লা ফাঁক করে দিলো রাসকোল্‌নিকভ। সে এখন মরিয়া। কিন্তু...

স্তম্ভিত হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

ঘরে দাঁড়িয়ে দু'জন মহিলা। রাসকোল্‌নিকভের মা আর বোন।

আচমকা দড়াম করে দরজা খুলে যাওয়ায় কয়েক সেকেণ্ড ভ্যাবাচাকা খেলে দু'জনেই। তারপরেই লাফিয়ে এসে জড়িয়ে ধরল রাসকোল্‌নিকভকে।

রাসকোল্‌নিকভ কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল কাঠের পুতুলের মত। হাত তুলে মা আর বোনকে জড়িয়ে ধরবার প্রবৃত্তি তার নেই। হাতে বুড়ির রক্ত লেগেছিল। হয়তো রক্তের গন্ধ এখনও রয়ে গেছে। মা আর বোন যদি সেই গন্ধ শুঁকে আঁতকে ওঠে?

রাসকোল্‌নিকভকে ওরা কিন্তু আদরে আদরে অস্থির করে তুলছে। সইতে পারল না ও। দু-পা এগিয়ে ঢুকল ঘরের মধ্যে...

তারপরেই দড়াম করে সটান আছড়ে পড়ল মেঝের ওপর!

ভয়ে ভীষণ জোরে চেঁচিয়ে ওঠে ওর মা আর বোন। ন্যাসটাসিয়া আগেই সব বলেছে। অজ্ঞান হয়ে ভুল বকেছে রাসকোল্‌নিকভ দিনের পর দিন।

চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে তার প্রমাণ! জ্ঞান নেই রাসকোল্‌নিকভের।

মেয়েদের চেঁচামেচিতে কান না দিয়ে সবেগে ঘরে ঢুকেছে রাজুমিখিন। দু-হাতে বন্ধুকে তুলে ধরে শুইয়ে দিলো বিছানায়।

কিছুক্ষণ সেবা করতেই জ্ঞান ফিরে এল রাসকোল্‌নিকভের।

তখন নিজেদের কথা বললেন পলচেরিয়া, মানে, রাসকোল্‌নিকভের মা।

বললেন—'আগে থেকে ছেলেকে খবর দিইনি—ভেবেছিলাম, লুজিন নিজেই স্টেশনে হাজির থাকবেন। কিন্তু ট্রেন থেকে নেমে দেখি, পাঠিয়ে দিয়েছেন একজন চাকরকে—নিজে আসেননি। তার সঙ্গে উঠলাম বাকালায়েভের বাড়িতে।'

এই পর্যন্ত শুনেই রাগে চেঁচিয়ে ওঠে রাজুমিখিন—'বাকালায়েভের বাড়িতে! ওটা তো একটা আড্ডাবাড়ি! ভদ্রঘরের মেয়েরা তো ওখানে থাকতে পারে না!'

তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন পলচেরিয়া—'আরে, দু-চার দিনের বেশি তো থাকছি না ওখানে!'

আসলে তিনি চান না, বিয়ের আগেই ভাবী জামাই-এর দুর্নাম হোক।

রাসকোল্‌নিকভকে কিন্তু আর থামিয়ে রাখা গেল না। বোমার মত ফেটে পড়ল সে—'এ বিয়ে হবে না!' বলেই দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রইল কাঠ হয়ে।

'কি বলছিস, রোডিয়া?' মা চেঁচিয়ে উঠলেন।

দুনিয়ার মুখে কথা নেই—শুধু গভীর বিস্ময় দুই চোখে।

পাশ ফিরে ছোট বোনের অবাক চাহনি দেখে বলে ওঠে রাসকোল্‌নিকভ—'দুনিয়া, আমার মঙ্গলের জন্যেই তুই ওই মহাকিপটেটাকে বিয়ে করবি ঠিক

করছিস, তাই না? কিন্তু তা হবে না। ওর মত ইতর লোকের ঠাঁই নেই আমাদের বংশে।'

এবার বিরক্ত হয় দুনিয়া—'ভাইয়া, আমার বিয়ে বন্ধ করার তুমি কে?'

রাজুমিখিন দেখলো, এখুনি লেগে যাবে ঝগড়া। তাড়াতাড়ি বলে ওঠে পলচেরিয়া আর দুনিয়াকে—'অসুস্থ মানুষটার সঙ্গে এখন কোনো কথা নয়। বাসায় যান। কথা হবে ঠাণ্ডা মাথায়—পরে।'

পলচেরিয়া বললেন—'দুনিয়া যাক বাসায়। আমি থাকি রোডিয়ার কাছে।'

গলার শিরা ফুলির চেঁচিয়ে ওঠে রাসকোল্‌নিকভ—'কী জ্বালা! একলা থাকতেও পারব না?'

পলচেরিয়ার কানে কানে বলে রাজুমিখিন—'আপনি যান। ও-বাড়িতে দুনিয়াকে একলা রাখবেন না। আমি আছি আপনার ছেলের কাছে।'

বলে প্রায় ঠেলেঠুলে মা আর মেয়েকে নিয়ে গেল বাইরে। সেখান থেকে গেল বাকালায়েভের বাড়িতে। আসবার সময়ে বলে এল পইপই করে—'রাতে একদম দরজা খুলবেন না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে জানিয়ে যাব কিরকম আছে রোডিয়া।'

চলে গেল রাজুমিখিন।

'চটপটে ছেলে। খুব ভালো ছেলে।' দুনিয়াকে বললেন পলচেরিয়া—'ভাগ্যিস ওকে পেলাম; নইলে কি ফ্যাসাদেই না পড়তাম! লুজিনের তো টিকি দেখা যাচ্ছে না।'

চুপ করে থাকে দুনিয়া।

সারারাত ছুটোছুটি করেই কাটালো রাজুমিখিন। পলচেরিয়ার কাছে খবর দিয়ে গেল দু-বার।

দ্বিতীয়বার এল ডাক্তার জোসিমভের সঙ্গে, বলে গেল, 'ভালই আছে রোডিয়া।'

মনটা এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হয় পলচেরিয়ার।

খুশি খুশি মনে বললেন মেয়েকে—'বড় চৌকস ছেলে রে! সত্যিই ভালবাসে রোডিয়াকে।'

'মানুষ হিসেবে চমৎকার!' এতক্ষণে একটাই মন্তব্য করে দুনিয়া।

পরের দিন চাঙ্গা হয়ে উঠল রাসকোল্‌নিকভ। ঠিক হল সন্ধ্যের দিকে রাজুমিখিনকে নিয়ে আড্ডা মারতে যাবে মা-এর কাছে।

কিন্তু তার আগে রাজুমিখিল গেল পর্ফাইরি পেত্রোভিচের কাছে। গোয়েন্দা-বিভাগের এই বড়কর্তাটি রাজুমিখিনের আত্মীয়। তাই ওকে সঙ্গে নিয়েই গেল।

পর্ফাইরি তখন তন্ময় হয়ে শুনছেন জামেটভের কথা।

এই সময়ে দুই বন্ধু ঘরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা শক্ত হয়ে গেল জামেটভের।

হাসছিল রাসকোল্‌নিকভ। হো হো করে হাসছিল। রঙ্গ রসিকতা হচ্ছিল বন্ধুর সঙ্গে। হাসি মিলিয়ে গেল জামেটভের মুখ দেখে। রাসকোল্‌নিকভকে দেখেই কঠিন হয়ে উঠেছে জামেটভ। হোটেলে খবরের কাগজ পড়বার পর অনেক বেফাঁস কথা বলে ফেলেছিল রাসকোল্‌নিকভ। সেইসব কথাই কি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে লাগানো হচ্ছিল বড় সাহেবের কাছে?

রাসকোল্‌নিকভের চোখে চোখেও সে তাকাচ্ছে না।

কথা বলে উঠলেন পর্ফাইরি—'আসুন, আসুন! আপনার কথাই হচ্ছিল জামেটভের সঙ্গে।'

'আমার কথা!' থমকে যায় রাসকোল্‌নিকভ।

'বেশ কিছুদিন আগে আপনার লেখা একটা প্রবন্ধ পড়েছি 'উইকলি রিভিউ' কাগজে।'

'উইকলি রিভিউ' কাগজে তো কোনো প্রবন্ধ পাঠাইনি। পাঠিয়েছিলাম 'পিরিয়ডিক্যাল রিভিউতে। সে কাগজ বন্ধ হয়ে গেছে।'

'বন্ধ হয়নি—'উইকলি রিভিউ' কাগজের সঙ্গে মিশে গেছে। তাই আপনার প্রবন্ধটা 'পিরিয়ডিক্যাল রিভিউতে ছাপা হয়নি—হয়েছে 'উইকলি রিভিউতে।'

'অনেক খবর রাখেন দেখছি।'

'তা রাখি বই কি। ভাল প্রবন্ধ চোখে পড়লেই পড়ি। আপনার লেখাটা চমৎকার! অপরাধ বিজ্ঞান সম্পর্কে।'

'সবটা পড়েছেন?' একটু কৌতূহলী হয় রাসকোল্‌নিকভ।

'গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত।' হাসেন পর্ফাইরি—'আপনার মৌলিক ভাবনাকে তারিফ জানাই। মানুষ জাতটাকে আপনি দু-ভাগ করেছেন—সাধারণ আর অসাধারণ।'

'জানলেন কি করে প্রবন্ধটা আমার লেখা? সম্পাদককে বলেছিলাম যেন আমার নাম ছাপা না হয়।'

'সম্পাদক আপনার নাম ছাপেননি। কিন্তু এত ভাল প্রবন্ধ কার লেখা জানতে ইচ্ছে হয়েছিল আমার। তাই সম্পাদককে জিজ্ঞেস করে নামটা জেনে নিয়েছি। অপরাধ করার আগে আর পরে অপরাধীর মনের অবস্থাটা কি-রকম দাঁড়ায়, তা নিয়ে আলোচনা করেছেন চমৎকার।'

'তা করেছিলাম বটে,' সায় দেয় রাসকোল্‌নিকভ।

'প্রবন্ধটায় আপনার দুটো নিজস্ব ভাবনা মনে রাখবার মত।'

'কি-কি বলুন তো?'

'অপরাধ করার সঙ্গে সঙ্গে অপরাধী খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে।'

'হ্যাঁ, লিখেছিলাম।'

'আপনার নিজস্ব আর একটা ভাবনা নিয়ে খুলে লেখেননি—শুধু ছুঁয়ে গেছেন। সেটা এই—এমন কিছু লোক আছে, আইন যাদের জন্যে নয়—যারা ইচ্ছে করলে যে কোনো অপরাধ করতে পারে। অপরাধ করাটা তাদের অধিকারের মধ্যে পড়ে।'

হেসে ফেলে রাসকোল্‌নিকভ—'ঠিক ওকথা লিখিনি। আমি যা বলতে চেয়েছি, তা এই—মনীষীরা পৃথিবীর উপকার করতে গিয়ে এমন কিছু কাজ করে ফেলতে পারেন। আইনের চোখে যা অপরাধ ছাড়া কিছুই নয়। যেমন ধরুন, নিউটন যদি দেখতেন, দু-একজনের মৃত্যু না ঘটালে বড় বড় আবিষ্কারগুলো করা যাচ্ছে না—তাহলে আইনের ভয়ে কি চুপ করে বসে থাকতেন? তিনি তো পৃথিবীর মঙ্গলের জন্যেই আবিষ্কারের পর আবিষ্কার করে গেছেন।'

কথা ঘুরিয়ে নিলেন পর্ফাইরি—'বলুন কেন এসেছেন?'

'আমার কিছু জিনিস বন্ধক আছে বুড়ি অ্যালিওনার কাছে। কিভাবে ফেরত পাওয়া যাবে?'

'কালকে আসুন। একটা দরখাস্ত করে দেবেন। আপনার আসবার পথ চেয়েই তো বসেছিলাম।' অমায়িকভাবে বলে গেলেন পর্ফাইরি।

চমকে ওঠে রাসকোল্‌নিকভ—'কেন?'

'সবাই তো আসছেন বন্ধকী জিনিস ফিরিয়ে নিতে। যার জিনিস, তার নাম লিখে জিনিসটাকে কাগজে মুড়ে রেখে দিত বুড়ি। কয়েকটা জিনিসের মোড়কে পাওয়া গেছে আপনার নাম। তাই জানতাম, আপনি আসবেনই। আসতে পারেননি অবশ্য অসুখের জন্যে...খুবই সন্দেহজনক অসুখ...কেননা, আপনিই তো লিখেছেন প্রবন্ধে—অপরাধ করার পরেই অসুস্থ হয়ে পড়ে আপরাধী! হা হা হা!'

রেগে যায় রাজুমিখিন—'অদ্ভুত কথা বলছেন! অপরাধ না করলে কারো অসুখ হতে পারে না?'

আর এক দফা হেসে নিয়ে বললেন পর্ফাইরি—'নিশ্চয় পারে! যাকগে, এ নিয়ে কথা হবে কালকে। ভাল কথা রাজুমিখিন, রঙ-মিস্ত্রী নিকোলের ব্যাপারটা মনে আছে? তুমি তো বলে খালাস—নিকোলে নির্দোষ। কিন্তু প্রমাণ কোথায়? এই যে আপনি ঘড়ি বন্ধক দিয়েছিলেন বুড়ির কাছে—কবে কখন গেছিলেন বলুন তো?'

'খুনের দু-দিন আগে—সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ।' বললো রাসকোল্‌নিকভ।

'তখন তো রঙ-মিস্ত্রীদের কাজ চলছিল দোতলার ফ্ল্যাটে। আপনিও দেখেছিলেন নিশ্চয়?'

'রঙ-মিস্ত্রী? দেখিনি তো!' থেমে থেমে বলে যায় রাসকোল্‌নিকভ।

হুঁশিয়ার সে। পর্ফাইরি তাকে কথার জালে জড়াতে চাইছেন, ফাঁদে ফেলতে চাইছেন—এটা সে বুঝেছে।

তাই, ধীরস্থিরভাবে গুছিয়ে জবাব দিল এইভাবে—'রঙ-মিস্ত্রী দেখিনি। কোনো ফ্ল্যাটে রঙ-মিস্ত্রী ছিল কিনা—তাও খেয়াল করিনি। তবে হ্যাঁ, চারতলার একটা ফ্ল্যাট থেকে কুলিরা জিনিসপত্র বের করার সময়ে আমার ঘাড়ে এসে পড়েছিল। কিন্তু রঙ-মিস্ত্রী তো দেখিনি!'

চেঁচিয়ে ওঠে কিন্তু রাজুমিখিন—'কি যে বলেন! রঙ-মিস্ত্রীরা কাজে লেগেছিল খুনের দিন। রাসকোল্‌নিকভ ঘড়ি বন্ধক দিতে বুড়ির কাছে গেছিল তার দু-দিন আগে—রঙ-মিস্ত্রীদের তখন দেখবে কি করে?'

ঠাম ঠাম করে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বলে উঠলেন পর্ফাইরি—'সব গুলিয়ে যাচ্ছে আমার নিজেরই। ছি ছি ছি! আপনি কিছু মনে করবেন না ভাই'—বললেন রাসকোল্‌নিকভের দিকে তাকিয়ে। 'এই খুনটা আমার সব গোলমাল করে দিচ্ছে। ঘটনার দিন রঙ-মিস্ত্রী নিকোলেকে ফ্ল্যাটে দেখতে পাওয়া গেছে—এমন কথা সাক্ষী হিসেবে কেউ যদি বলত—সহজ হয়ে যেত আমাদের কাজ।'

'খুনের ব্যাপারে এইভাবে মাথা গুলিয়ে ফেললে অন্যের পক্ষে তা ভয়ানক পরিণতি ঘটাতে পারে,' কড়া গলায় কথাগুলো বলে গটগট করে ঘরের বাইরে চলে এল রাজুমিখিন।

রাস্তায় নেমে গম্ভীর হয়ে রইল দুই বন্ধুই। কারো মুখে কোনো কথা নেই।

নয়

বাড়ি ফিরেই ঘুমিয়ে পড়েছিল রাসকোল্‌নিকভ। ঘুম ভাঙতেই দেখল, সামনে বসে আছেন এক ভদ্রলোক।

অবাক গলায় শুধোয় রাসকোল্‌নিকভ—'আপনাকে তো চিনতে পারলাম না?'

'আমার নাম সিদ্রিগয়লভ।'

'সিদ্রিগয়লভ! আপনার বাড়িতে দুনিয়া কিছুদিন ছেলেমেয়ে পড়িয়েছিল?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'দুনিয়ার নামে বাজে কথা ছড়িয়েছিলেন আপনি আর আপনার স্ত্রী মার্ফা তাড়ায় তাকে বাড়ি থেকে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু দেখুন—ভুলটা তো পরে ধরা পড়েছিল,' আমতা আমতা করতে থাকে সিদ্রিগয়লভ।

কড়া গলায় বলে রাসকোল্‌নিকভ—'এখানে এসেছেন কি মতলবে?'

'কুমতলবে নয়।'

'ধানাই-পানাই ছাড়ুন। কেন এসেছেন?'

'রেগে যাবেন না, শুনুন। দুনিয়ার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার জন্যে আমি অনুতপ্ত। তাই ওকে দশ হাজার রুব্‌ল দিতে চাই।'

নিমেষে মাথায় রক্ত চড়ে যায় রাসকোল্‌নিকভের—'জুতো মেরে গরু দান করতে এসেছেন? বেরিয়ে যান— বেরিয়ে যান—এখুনি!'

মুখ লাল হয়ে যায় সিদ্রিগয়লভের—'আমার স্ত্রী মারা যাবার সময়ে তার শেষ ইচ্ছাপত্রে তিন হাজার রুব্‌ল দিয়ে গেছে দুনিয়াকে—'

'দূর হয়ে যান!'

রাসকোল্‌নিকভের রুদ্রমূর্তি দেখে আর ঘরে থাকবার সাহস হয় না সিদ্রিগয়লভের।

সন্ধ্যে নাগাদ মা আর বোনের দাওয়াত রাখতে গেল রাসকোল্‌নিকভ। সঙ্গে রাজুমিখিন।

বললো—'দুনিয়া, সিদ্রিগয়লভ সকালে এসেছিল আমার কাছে।'

'কেন?' মুখ শক্ত হয়ে যায় দুনিয়ার। সিদ্রিগয়লভ লোকটা যে কতখানি নীচ, সে তা হাড়ে হাড়ে জেনেছে।

'খারাপ ব্যবহার করার জন্যে সে অনুতপ্ত। তাই তোকে দশ হাজার রুব্‌ল দিতে চায়।'

'চাই না। অমন লোকের মুখও দেখতে চাই না।'

'কিন্তু ওর স্ত্রী যে তোকে তিন হাজার রুব্‌ল দিয়ে গেছেন শেষ ইচ্ছা হিসেবে।'

'তাই নাকি!' দুনিয়ার রুষ্টমুখে এবার খুশির রোশনাই দেখা দেয়—'ভদ্রমহিলার মনটা বড় ভাল। ভুল বুঝতে পেরে আমি যে নির্দোষ সে কথাটা শহরসুদ্ধ সবাইকে নিজেই জানিয়েছিলেন—'

'তাহলে,' বললেন দুনিয়ার মা—'ওঁর টাকা নিতে ক্ষতি কী?'

'পরে ভাবা যাবে, মা,' বলে দুনিয়া।

'নিলে বেঁচে যাই রে। শহরে এসেছি যার ভরসায়—সে তো কানাকড়িও দিচ্ছে না, দেবে বলেও মনে হচ্ছে না—রোডিয়া ওকে যা অপমান করেছে।'

'করেছি—আবার করব,' রেগেমেগেই বলে ওঠে রাসকোল্‌নিকভ।

'বোকা ছেলে! মাথা গরম করিসনি, বাবা। আজকের চা-এর আসরে তাকেও যে দাওয়াত করেছি।'

'লুজিনকে!'

'হ্যাঁরে। মিটমাট করে নে—হাজার হোক ভাবী জামাই তো।'

'কক্ষণো না।'

শেষ হল না রাসকোল্‌নিকভের কথা। ঘরে ঢুকল স্বয়ং লুজিন।

ঢুকেই চোখমুখ লাল করে ফেলল রাসকোল্‌নিকভকে দেখে। সঙ্গে সঙ্গে সে কী চিৎকার—'এ লোকটাকে ডেকেছেন কেন?'

'লোকটা!' থতমত খেয়ে যান রাসকোল্‌নিকভের মা—'আমার ছেলে তো থাকবেই।'

'আমাকে যে অপমান করে, তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আমি রাখতে চাই না।'

'তাহলেও সে আমার ছেলে।'

'তাহলে আপনার মেয়েকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

এইবার রেগে যায় দুনিয়া—'আমার ভাই-এর সঙ্গে যে সম্পর্ক রাখতে চায় না—তার সঙ্গে আমিও কোনো সম্পর্ক রাখতে চাই না। হাজার হলেও সে আমার ভাই।'

দুনিয়ার মুখ দিয়ে যে এমন কথা বেরোবে, তা ভাবতেও পারেনি লুজিন। রেগে টং হয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে।

আর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ঘরের সবাই। লুজিন ভেবেছে, মা-বোন-ভাই পথের ভিখিরি। তাই তাদের দেমাক ভাঙবেই—শহরে থাকতে হলে টাকার দরকার, টাকার মালিক তো লুজিন! কিন্তু সে জানে না, তিন হাজার রুব্‌ল পেতে চলেছে দুনিয়া।

আলোচনা শুরু হল এই তিন হাজার রুব্‌লকে কেন্দ্র করে।

রাজুমিখিন বললো—'তিন হাজারের এক হাজার ব্যবসায়ে লাগানো যাক। আরও এক হাজার দেবে আমার চাচা।'

'কিসের ব্যবসা?' রাসকোল্‌নিকভের প্রশ্ন।

'বই ছাপানোর ব্যবসা। প্রকাশকদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে—জানি এ-ব্যবসা কিভাবে চালাতে হয়।'

'তাহলে আর দেরি কেন, শুরু করে দাও।'

'তুমিও তো থাকছ ব্যবসায়ে?'

'জবাবটা পরে দিচ্ছি।'

একটু পরেই পথে নেমে এল দুই বন্ধু।

রাজুমিখিন শুধালো তক্ষুণি—'জবাবটা এবার দাও।'

গম্ভীর গলায় বললো রাসকোল্‌নিকভ—'বন্ধু, কোনো ব্যবসাতেই আর থাকছি না আমি; কারণ তোমাদের সঙ্গেই আর থাকা হবে না আমার।'

'মানে?' অবাক হয়ে যায় রাজুমিখিন।

'মানেটা বুঝে নাও।' চোখে চোখে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে বললে রাসকোল্‌নিকভ—'আর, আমার একটা কথা রেখো। দুনিয়াকে বিয়ে কোরো। তাহলেই শান্তি পাব

আমি। জানব, মা আর বোনের পাশে আছে তোমার মতো বন্ধু।'

রাজুমিখিনের সারা শরীর শিরশির করে ওঠে। চোখের ভাষায় আর গলার সুরে অনেক রহস্যই তো ব্যক্ত করে দিল রাসকোল্‌নিকভ!

রাসকোল্‌নিকভ এখন দাঁড়িয়ে ওর বাড়ির সামনে। একা। একটু দূরে দাঁড়িয়ে দুটি লোক। একজন এবাড়ির দারোয়ান—আর একজন সেই বেঁটে রঙ-মিস্ত্রীটা। বুড়ি অ্যালিওনার ফ্ল্যাটে যে তেড়ে কথা বলেছিল রাসকোল্‌নিকভের সঙ্গে। পুলিশের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল ওকে।

রাসকোল্‌নিকভকে দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল দারোয়ান। বেঁটে রঙ-মিস্ত্রী পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াল ওর সামনে।

বললো ফিসফিস করে—'খুনী!'

বলেই হনহন করে উধাও হয়ে গেল পথে। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রাসকোল্‌নিকভ!

রাতে যেতে হল মার্মেলাডভের বাড়িতে। আজ তাকে কবর দেওয়া হয়েছে। তাই সামান্য খাওয়ার আয়োজন করেছে ওর বউ ক্যাটেরিনা।

দাওয়াত করে গেছিল সোনিয়া—মার্মেলাডভের সেই ষোল-সতের বছরের মেয়ে—যে পাপের পথে রোজগার করে চলেছে অভাবের জ্বালায়।

তাই রাসকোল্‌নিকভ গেল দাওয়াত রাখতে।

এবং ওর সামনেই ঘটে গেল একটা বিশ্রী কাণ্ড!

হঠাৎ ভীষণ রেগেমেগে ঘরে ঢুকল লুজিন!

সেই সঙ্গে শুরু হয়ে গেল তারস্বরে চিৎকার—'চোর! চোর!'

'কে চোর?' রুদ্রমূর্তি নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে রাসকোল্‌নিকভ।

'সোনিয়া! একশ রুব্‌ল চুরি করেছে আমার ঘর থেকে!'

থ হয়ে যায় সোনিয়া—'আমি'!

'ন্যাকা! যেন কিচ্ছু জানে না! একটু আগেই তো গিয়েছিলে আমার ঘরে।'

'আপনিই তো ডেকে পাঠালেন—দশটা রুব্‌ল দিলেন মাকে দেবার জন্যে।'

'তখুনি নিয়েছ একশ রুব্‌লের নোটটা।'

'কক্ষণো না।'

'বেশ তো, দেখাও তোমার পকেট।'

রেগেমেগে পকেটে হাত দিয়েই ফ্যাকাশে হয়ে গেল সোনিয়া। আস্তে আস্তে বের করল হাত।

মুঠোয় রয়েছে একশ রুব্‌লের একটা নোট!

কিন্তু ভগবান আছেন। তিনিই বাঁচালেন সোনিয়াকে এই বিষম বিপদ থেকে।

ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকল একজন যুবক। রাগে থমথম করছে তার চোখমুখ। গনগনে চোখে লুজিনের দিকে তাকিয়ে সে প্রথমেই শুধু বললো—'ছি ছি ছি!'

বিবর্ণ হয়ে গেল লুজিন।

চোখ ছোট হয়ে আসে রাসকোল্‌নিকভের।

বলে—'তুমি কে?'

'আমার নাম লেবেজিয়াৎনিকভ। এই বাড়িতেই থাকি আমি। আমার ঘরেই উঠেছে এই লুজিন। একটু আগেই আমাকে বলেছিল, সোনিয়াকে ডেকে দিতে।'

'তারপর?'

'ডেকে নিয়ে গিয়েছিলাম সোনিয়াকে। দয়ার অবতার হয়ে লুজিন যখন ওকে দশটা রুব্‌ল দিল তখন আমি ঘরেই ছিলাম। তারপর ছিলাম ঘরের বাইরে। কিন্তু আড়াল থেকেই দেখেছি লুজিনের হাতসাফাই।'

'হাতসাফাই?'

'একশ রুব্‌লের এই নোটটা টুক করে ফেলে দিল সোনিয়ার পকেটে। তখন ভেবেছিলাম, কাউকে না জানিয়ে বুঝি আরও দান করছে—তাই বলিনি আমি দেখে ফেলেছি। কিন্তু এখন তো দেখছি উল্টো ব্যাপার। সোনিয়াকে চোর সাজানোই ওর উদ্দেশ্য!'

সিংহের মতো গর্জে ওঠে রাসকোল্‌নিকভ—'বন্ধু! ওর আসল উদ্দেশ্য আমাকে অপমান করা; কারণ ওকে আমি তাড়িয়েছি বাড়ি থেকে, আমার বোন চায় না ওকে বিয়ে করতে। কিন্তু তবুও সোনিয়া দাওয়াত করে এনেছে আমাকে—তাই।'

চকিতে হাওয়া হয়ে গেল বদমাশ লুজিন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই চম্পট দিল বাড়ি থেকে।

রাসকোল্‌নিকভের জীবন থেকে চিরকালের মত বিদায় নিল লুজিন! সবাই যার যার বাড়ি ফিরে গেল।

ঠিক এক ঘণ্টা পর।...

সোনিয়া নিজের ঘরে ফিরে এসেছে। ভাবছে, আশ্চর্য মানুষ বটে এই রাসকোল্‌নিকভ। এক পয়সাও নেই নিজের কাছে—অথচ পকেট উজোড় করে পঁচিশ রুব্‌ল দিয়েছে তার মাকে বাবার শেষ কাজের জন্যে!

আজ সকালেই দাওয়াত করতে গিয়ে সে দেখে এসেছে কত দীনহীন অবস্থায় থাকে রাসকোল্‌নিকভ। সোনিয়ার চাইতেও তার অবস্থা খারাপ। অথচ দুর্গতকে সাহায্য করার সময়ে নিজের কথা খেয়াল করে না...

ঠিক এই সময়ে নড়ে উঠল দরজার কড়া।

এত রাতে আবার কোন আপদ এল, ভাবতে ভাবতে দরজা খুলে দিলো সোনিয়া।

চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রাসকোল্‌নিকভ!

'আপনি!' সত্যিই অবাক হয়ে যায় সোনিয়া। সে খারাপ মেয়ে—রাসকোল্‌-নিকভের মত ভালো মানুষ তার কাছে এত রাতে আসবে—এ যে ভাবাও যায় না!

ঘরে ঢুকল রাসকোল্‌নিকভ। সে এসেছে মনের বোঝা কমাতে। সোনিয়া খারাপ মেয়ে। সে নিজেও তো খারাপ লোক—খুন করেছে দু-দুজন নারীকে।

বসল চেয়ারে। হঠাৎ চোখ পড়ল টেবিলে। সেখানে রয়েছে একটা বাইবেল।

সে আবেগমাখা গলায় বললো—'সোনিয়া, বাইবেল থেকে কিছু পড়ে শোনাবে?'

নীল-নীল চোখে রাসকোল্‌নিকভের উদ্‌ভ্রান্ত মুখের দিকে চেয়ে সোনিয়া কি বুঝল, সে-ই জানে।

বসল ওর সামনে। বাইবেল তুলে নিয়ে মন দিয়ে পড়ে গেল বেশ কিছু শান্তির কথা। ল্যাজারাসের আবার বেঁচে ওঠার মনছোঁয়া কাহিনী।

শুনতে শুনতে অভিভূত হয়ে গেছিল রাসকোল্‌নিকভ। সোনিয়া স্তব্ধ হতেই সোনিয়ার দু-হাত চেপে ধরে বলে উঠল আবেগঘন গলায়—'আমিও আবার বাঁচতে চাই, সোনিয়া—ঈশ্বর কি সে সুযোগ আমাকে দেবেন না?'

'নিশ্চয় দেবেন।'

ব্যস, ভেঙে পড়ল রাসকোল্‌নিকভ। মন উজাড় করে বলে গেল সমস্ত কথা। স—ব।

সব শুনে গভীর গলায় সোনিয়া শুধু একটা কথাই বললো—'প্রায়শ্চিত্ত করো।'

দরজা তখন বন্ধ ছিল। কিন্তু পাল্লার ওদিকে দাঁড়িয়েছিল সিদ্রিগয়লভ। যাকে আজ সকালেই দূর-দূর করে তাড়িয়েছে রাসকোল্‌নিকভ। সে এসেছিল সোনিয়ার সঙ্গে আড্ডা মারতে, পাশের ঘরেই যে উঠেছে।

রাসকোল্‌নিকভ খুনী! কথাটা জেনেই আনন্দে নেচে উঠল সিদ্রিগয়লভ। দুনিয়া মেয়েটাকে পায়ের তলায় রাখবার সুযোগ এসে গেছে হাতের মুঠোয়। দশ হাজার রুব্‌ল দিতে গিয়েও যা করা সম্ভব হয়নি—এবার তা সম্ভব হবে, শুধু একটা চিঠির মাধ্যমে। শুধু একটা চিঠি!

চিঠিখানা লেখা হল দুনিয়াকে। পরের দিনই, তার ভাই যে মহাঅপরাধ করেছে—তা জানে শুধু সিদ্রিগয়লভ। দুনিয়া যদি এখুনি না আসে—তাহলে পুলিশকে জানানো হবে সমস্ত কথা।

ঠিক তখুনি পুলিশের বড়কর্তার সামনে হাজির হল রাসকোল্‌নিকভ।

সোনিয়া তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বলেছে। কিন্তু সহজে ধরা দেবে না সে। তাহলে যে পুলিশ জিতে যাবে।

আগে হার স্বীকার করুক পুলিশ। তারপর রাসকোল্‌নিকভ ধরা দেবে নিজে।

বড়কর্তা পর্ফাইরি বড় ধুরন্ধর। বুদ্ধির খেলা খেলছেন ওর সঙ্গে। গতকাল কথার ফাঁদে ফেলতে গিয়েছিলেন—পারেননি। আজকে ডেকেছেন নিশ্চয় অন্য মতলবে।

দেখা যাক, বুদ্ধির যুদ্ধে কে জেতে!

বন্ধকী জিনিসগুলো ফেরৎ নেবার জন্যে একটা দরখাস্ত লিখে নিয়ে গিয়েছিল রাসকোল্‌নিকভ।

কিন্তু তা দেখলেন না পর্ফাইরি। ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বন্‌বন্‌ করে চর্কিপাক দিতে লাগলেন ঘরময়। আর বকে গেলেন সমানে।

বললেন—'আপনি যে খুনী, সে প্রমাণ এখনও পাইনি। তবে পাঁচটা কারণে আপনাকে সন্দেহ করছি।'

'যথা?' চোখ নাচিয়ে বলে রাসকোল্‌নিকভ।

'এক নম্বর কারণ—খুনের ঠিক পরেই আপনি অসুস্থ হলেন। দু-নম্বর কারণ, অসুখ সারতে না সারতেই বুড়ির ফ্ল্যাটে গিয়ে মিস্ত্রীদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন—রক্ত গেল কোথায়? তিন নম্বর কারণ, জামেটভকে খুব বড়াই করে বলেছিলেন—আপনি নিজে খুন করলে লুটের মাল লুকোতেন কিভাবে।'

'চার নম্বর কারণটা?' অধীর গলায় শুধোয় রাসকোল্‌নিকভ।

'কাল হাসতে হাসতে বন্ধুকে নিয়ে ঢুকলেন আমার ঘরে। হাসিটা অস্বাভাবিক। লোক-দেখানো হাসি।'

'বড্ড বাজে বকছেন,' চড়া গলায় এবার বলে রাসকোল্‌নিকভ—'পাঁচ নম্বর কারণটা দয়া করে বললেন?'

অট্টহেসে বললেন পর্ফাইরি—'সেটা নিজের চোখেই দেখে যান। এই নিন চাবি। খুলুন ওই দরজাটা। দেখুন পঞ্চম কারণ কে?'

রেগেমেগে চাবি নিয়ে উঠে যাচ্ছিলো রাসকোল্‌নিকভ। ঠিক এই সময়ে হইচই শোনা গেল বাইরে। কে যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে—'আমি খুনী! আমি খুনী! আমি খুনী!'

একদল পুলিশ কর্মচারি ঢুকে পড়ল ঘরে। বললো সোল্লাসে—'ঐ শুনুন—নিকোলে স্বীকার করছে—খুন করেছে ও নিজেই।'

'ঠিক আছে, যাও তোমরা।' বলে, কর্মচারিদের ঘর থেকে বিদেয় করে, মুচকি হেসে রাসকোল্‌নিকভের হাত থেকে চাবিটা কেড়ে নিলেন পর্ফাইরি—নিকোলের গুষ্টিসুদ্ধ মাথা খারাপ। হাজতবাস করে দেখছি ওর পাগলামি বেড়েছে।'

অবাক গলায় বললো রাসকোল্‌নিকভ—'আপনি বিশ্বাস করেন না, নিকোলে খুন করেছেন ?'

'একেবারেই করি না।'

'তবে কে করেছে ?'

'আপনি করেছেন। কিন্তু প্রমাণ নেই। সন্দেহ যা ছিল, তা এই বোকা নিকোলের পাগলামির ফলে টিকল না। ইচ্ছে ছিল, আজই আপনাকে গ্রেপ্তার করব। ঠিক আছে, আরও দিন কয়েক ঘুরে বেড়ান। তারপর—'

কিন্তু দরজার ওপারে রহস্যময় সেই পঞ্চম প্রমাণটা কী ?

দশ

চিঠি পেয়েই ছুটে এল দুনিয়া। সিদ্রিগয়লভ ঘরে ছিল তারই প্রতীক্ষায়। উঠে গিয়ে দরজায় চাবি দিয়ে রাখল নিজের পকেটে।

বসল মুখোমুখি দুটি চেয়ারে।

'বলুন, কেন ডেকেছেন ?' বুক কাঁপছে দুনিয়ার। না জানি কি কথাই শুনতে হবে এখুনি ভাই সম্পর্কে। রাসকোল্‌নিকভ সম্বন্ধে অনেক কানাঘুষো কথা তার কানে আসছে। পুলিশ নাকি তাকে খুনের ব্যাপারে সন্দেহ করেছে।

কিন্তু রাসকোল্‌নিকভ নিজে কাউকে কিছু বলছে না। বরং যেন পালিয়ে বেড়াচ্ছে। মা আর বোনকে সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। তাদের ভারও ছেড়ে দিয়েছে প্রিয় বন্ধু রাজুমিখিনের ওপর।

জ্ঞানীগুণী, শিক্ষিত, বুদ্ধিমান রাসকোল্‌নিকভ। ইদানীং তার হাবভাব পাগলের মতো। এই কারণেই পুলিশের আরও সন্দেহ।

তাই দুনিয়া ছুটে এসেছে চিঠি পেয়েই। খুবই নীচ লোক এই সিদ্রিগয়লভ। কিন্তু শহরে নিশ্চয় বদমায়েশি করতে সাহস পাবে না। এটা তার মফস্বলের জমিদার বাড়ি নয়। সেখানে সে রাজা হতে পারে...

সিদ্রিগয়লভ কুটিল হেসে বলে উঠল—"দুনিয়া, তোমার ভাই খুন করেছে বুড়ি অ্যালিওনা আর তার বোনকে। লুট করেছে গয়না আর টাকার থলি।'

'আপনি জানলেন কি করে ?'

'আড়ি পেতে।'

'মানে ?'

'পাশের ঘরেই থাকে সোনিয়া। কাল রাতে রাসকোল্‌নিকভ এসেছিল সেই ঘরে। নিজেই সব খুলে বলল সোনিয়াকে। আমি শুনলাম দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে।'

দুনিয়ার মুখ কালো হয়ে যায়। খুনী! রাসকোল্‌নিকভ সত্যিই খুনী! নিজের মুখে যখন কবুল করেছে...

সিদ্রিগয়লভ বললো—'দুনিয়া, যদি আমার একটা কথা শোনো, তাহলে আমি পুলিশকে কিচ্ছু বলব না।'

'কি কথা?' গলা শুকিয়ে গেছে দুনিয়ার।

'আমাকে বিয়ে করতে হবে।'

'জাহান্নমে যান আপনি!'

'তাহলে তো রাসকোল্‌নিকভকেও সাইবেরিয়ায় যেতে হবে।'

'তাই যাবে। অপরাধ করলে শাস্তি পেতে হবে বই কি!'

'সেকী! সে না তোমার ভাই!'

'ভাই বলে কি অন্যায়ের সাজা পাবে না? চললাম আমি।' বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় দুনিয়া।

উঠে দাঁড়ায় সিদ্রিগয়লভ-ও। মুখে তার ক্রূর হাসি। টাকার লোভ দেখিয়ে হল না। ভাইকে পুলিশে দেবার ভয় দেখিয়েও হল না।

তাহলে এবার গায়ের জোর কাজে লাগানো যাক...

দাঁতে দাঁত চেপে বললো—'কোথায় যাবে, দুনিয়া? ঘর যে বন্ধ। আমাকে বিয়ে করতে রাজি না হলে এ-ঘর থেকে তো বেরোতে পারবে না!'

আগুন জ্বলে উঠল দুনিয়ার চোখে। বড় তেজী মেয়ে সে। এ রকম একটা সম্ভাবনার কথা ভেবেই তৈরি হয়ে এসেছিল আগে থেকে।

একটানে পকেট থেকে বের করল একটা পিস্তল এবং সটান গুলি করল সিদ্রিগয়লভকে...

গুলি বেরিয়ে গেল তার কানের পাশ দিয়ে—চামড়া উড়িয়ে দিয়ে। রক্তের স্রোত নেমে এল কাটা জায়গা থেকে।

পাথরকঠিন মুখে আবার পিস্তল টিপ করেছে দুনিয়া। সিদ্রিগয়লভ এগিয়ে আসছে ওকে ধরবে বলে...

ঘোড়া টিপতে গেছে দুনিয়া...

এমন সময়ে চোখে পড়ল রক্ত গড়াচ্ছে সিদ্রিগয়লভের কানের পাশ দিয়ে ঘাড়ের ওপর...

রক্ত!

খুন! দুনিয়া খুন করতে চলেছে! জীবন নিতে চলেছে!

প্রভু যিশু কিন্তু বলেছেন—'কখনও কারো জীবন নিও না।'

থরথর করে কেঁপে ওঠে দুনিয়া। ছুঁড়ে ফেলে দেয় পিস্তল।

'কি হল?' চমকে ওঠে সিদ্রিগয়লভ।

আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে দুনিয়া শুধু বললো—'কারো প্রাণ নেবার অধিকার আমার নেই। কপালে যা আছে—তাই হোক!'

থমকে গেল সিদ্রিগয়লভ। পিছিয়ে গেল এক-পা এক-পা করে!

আশ্চর্য মেয়ে তো এই দুনিয়া! বিপদ সামনে জেনেও নীতিকে বিসর্জন দেয় না! ভগবানের নাম নেয়!

পকেটে থেকে চাবি বেরে করে ছুঁড়ে দিল সিদ্রিগয়লভ। বললো ভাঙা গলায়—'যাও দুনিয়া, চলে যাও।'

দরজা খুলে বেরিয়ে গেল দুনিয়া।

পাশের ঘরে ঢুকল সিদ্রিগয়লভ। এ-ঘর সোনিয়ার।

বললো—'সোনিয়া, তোমার তিন ভাইবোনকে আশ্রমে ভর্তি করে দাও। আমার এই চিঠি আর তিনজনের জন্যে এই তিন হাজার রুব্‌ল সঙ্গে নিয়ে যাও। অসুবিধে হবে না।'

সোনিয়া স্তম্ভিত।

সিদ্রিগয়লভ বলে চললো—'আরও তিন হাজার রুব্‌ল দিচ্ছি তোমাকে।'

'কেন?'

'রাসকোল্‌নিকভ সাইবেরিয়ায় গেলে তোমাকেও তো সঙ্গে যেতে হবে—নিজের খরচেই যেতে হবে। সরকার দেবে না সে-টাকা। এই তিন হাজার রুব্‌ল তখন কাজে লাগবে।'

বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সিদ্রিগয়লভ।

পকেটে রয়েছে একটা পিস্তল। যে-পিস্তল একটু আগেই ঘরের মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল দুনিয়া।

যার মধ্যে তখনও রয়েছে একটা গুলি।

কাঁদতে কাঁদতে বললো দুনিয়া—'দাদা, এইবার ধরা দাও। আমার জন্যে, মায়ের জন্যে ভেবো না—ঈশ্বর আমাদের দেখবেন।'

'হ্যাঁ, ধরা দেব এবার।' শান্ত গলায় বললো রাসকোল্‌নিকভ। বুদ্ধির খেলায় জিতেও সে হেরে গেল ভাগ্যের কাছে। এতদিন কোনো প্রমাণ পায়নি পুলিশ।

পাবে এবার। সিদ্রিগয়লভ সাক্ষী দেবে। জেরার মুখে সোনিয়াও সত্যি কথাই বলবে।

সুতরাং ধরা দেয়া যাক।

উঠে দাঁড়িয়েছে দুনিয়া। রাসকোল্‌নিকভ তাকে বললো—'আমার একটা কথা রাখিস। রাজুমিখিনকে বিয়ে করিস।'

কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল দুনিয়া।

উঠে দাঁড়াল রাসকোল্‌নিকভ—'এবার যাওয়া যাক পুলিশ দপ্তরে।'

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল একটা লোক—সেই বেঁটে রঙ-মিস্ত্রী। যে তাকে গতকাল ফিসফিস করে বলেছিল—'খুনী'!

চমকে বলে ওঠে রাসকোল্‌নিকভ—'কী ব্যাপার?'

বেঁটে রঙ-মিস্ত্রী সজল চোখে বললো—'ক্ষমা চাইতে এসেছি।'

'কেন?'

'অন্যায় করেছি বলে।'

'কি অন্যায়?'

'তুমি খুন করোনি—করেছে নিকোলে। আমি কিন্তু তোমাকে খুনী বলেছি। সব্বাইকে তাই বলে বেড়িয়েছি।'

'তুমি!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি। পুলিশ দপ্তরে চাবি নিয়ে দরজা খুলে যে পঞ্চম প্রমাণটাকে দেখতে যাচ্ছিলো—সেটা কী, তা জানো?'

'পঞ্চম প্রমাণ!'

'হ্যাঁ, মোক্ষম প্রমাণ! আমি...আমি...আমিই ছিলাম দরজার আড়ালে!'

'তুমি!'

'দরজা খুলেই আমাকে দেখে আঁতকে উঠে নিশ্চয় বেফাঁস কথা বলে ফেলতে। কিন্তু ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন। নিকোলে ঠিক সেই মুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠেছে।'

'নিকোলে নিশ্চয় এবার নির্বাসনে যাবে সাইবেরিয়ায়?'

'তা তো যাবেই।'

পুলিশ দপ্তর। রাসকোল্‌নিকভ ঘরে ঢুকতেই ছুটে এল ইলিয়া পেত্রোভিচ—'কী লজ্জা! কী লজ্জা! খামোকা আপনাকে সন্দেহ করেছিলাম। নিকোলে সব স্বীকার করেছে। ওকেই যেতে হবে সাইবেরিয়ায়।'

প্রচণ্ড ঝোঁক এল রাসকোল্‌নিকভের। এবার সরে পড়লেই তো হয়!

না, না, না! সিদ্রিগয়লভ এখুনি আসবে—বলবে সব কথা। ধরা দেয়া যাক তার আগেই...

নিজেকে সামলে নিল রাসকোল্‌নিকভ।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন নিকোডিম ফোমিচ—পুলিশের বড় সাহেব।

রাসকোল্‌নিকভকে তিনি দেখেই উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন ইলিয়াকে—'কী কাণ্ড! গুলি করে নিজেই নিজের খুলি উড়িয়ে দিয়েছে লোকটা!'

'কে সে?' ইলিয়ার প্রশ্ন।

'সিদ্রিগয়লভ।'

মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল রাসকোল্‌নিকভ। সামলে নিল টেবিলের কোণ ধরে।

ভগবান কি মুখ তুলে চাইলেন? শেষ বিপদটাকেও কাটিয়ে দিলেন? এখন সে নিজে ধরা না দিলে কেউ আর তাকে ধরতে পারবে না...

হেসে বললেন নিকোডিম—'খুব চিন্তায় ফেলেছিলাম আপনাকে, তাই না?'

ভাঙা গলায় বললো রাসকোল্‌নিকভ—'এসেছিলাম জামেটভের কাছে। চললাম।'

বলে এগোলো দরজার কাছে। নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

উঠোনের ফটকে দাঁড়িয়ে আছে সোনিয়া। হাতে তার বাইবেল। দু'চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত।

মিলিয়ে গেল রাসকোল্‌নিকভের মনের লড়াই। দৃঢ় সঙ্কল্প শক্ত করে তুলেছে মনকে। মুখে ভাসছে এখন শান্তির জ্যোতি।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ধীরপদে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ঘরের মাঝখানে। নিকোডিমের টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে প্রশান্ত প্রসন্ন স্বরে বললো—'আমিই সে-ই।'

'কী?' চোখ তুলে হাসলেন নিকোডিম।

'খুনী!'

আট বছরের জন্যে রাসকোল্‌নিকভকে সাইবেরিয়ায় পাঠালেন বিচারকরা। হাল্কা সাজা দেয়া হল শুধু এই কারণে যে, সে নিজে স্বীকার না করলে কেউ তাকে ধরতে পারত না।

কয়েদীদের সঙ্গে সে সাইবেরিয়ার পথে রওনা হতেই আর একজন নিজের খরচে পা বাড়ালো সে দিকেই।

নাম তার, সোনিয়া।

❑